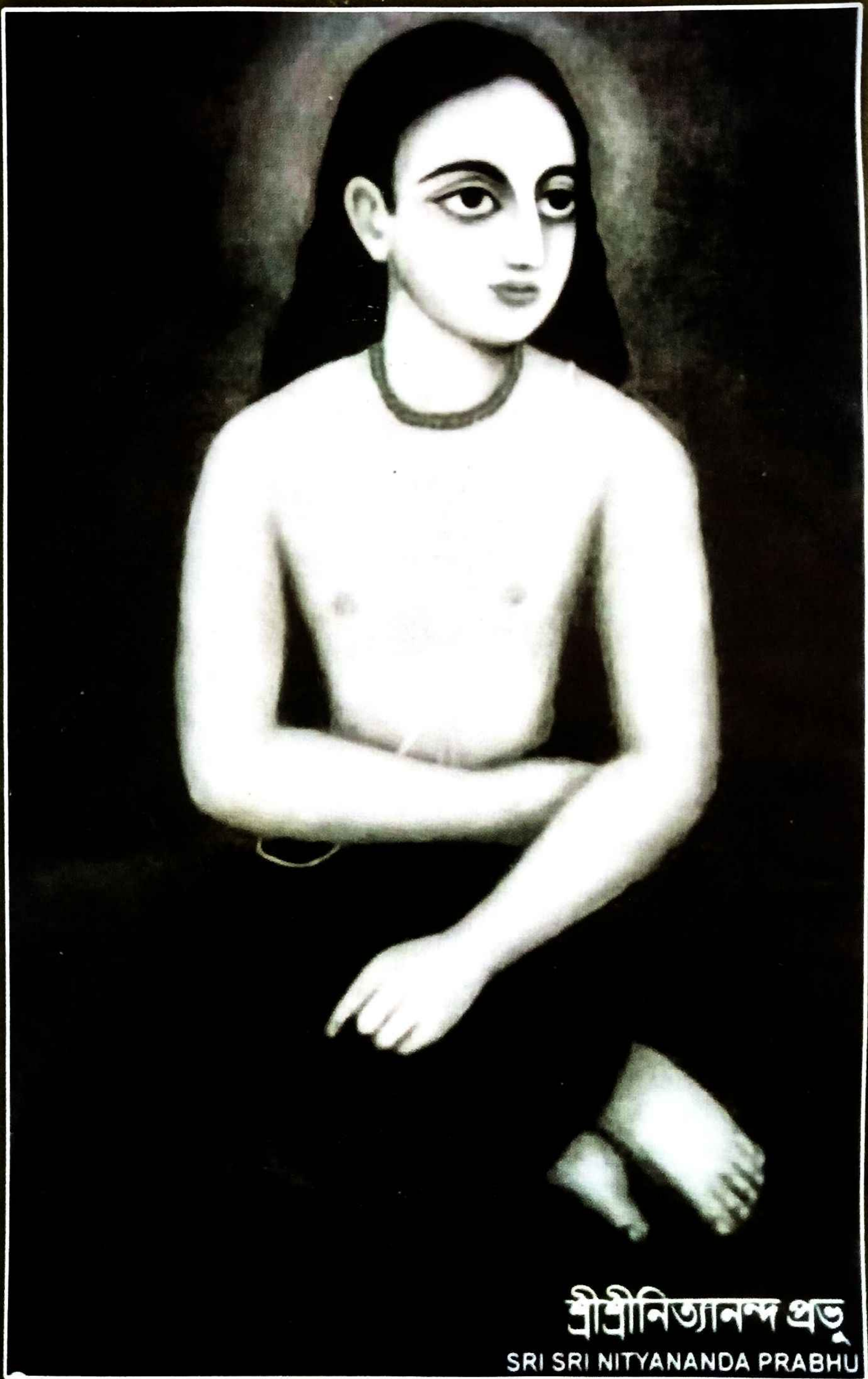

শ্রীপাট পানিহাটি পরিচয়
ও
দণ্ডমহোৎসব
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান। নিতাইবাড়ি। একচক্রা-গর্ভবাস।
বীরচন্দ্রপুর। বীরভূম - ৭৩১ ২৪৫। পশ্চিমবঙ্গ।



শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

SRI SRI NITYANANDA PRABHU

পরতত্ত্ব প্রকাশন
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান গ্রন্থমালা—১৮

শ্রীপাট পানিহাটি পরিচয়
ও
দণ্ডমহোৎসব



পরতত্ত্ব প্রকাশন
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দজন্মস্থান ✱ নিতাইবাড়ি ✱ একচক্রা-গর্ভবাস
বীরচন্দ্রপুর-৭৩১ ২৪৫ ✱ বীরভূম ✱ পশ্চিমবঙ্গ ✱ ভারতবর্ষ

E-mail : nityanandajanmasthansevamandal@rediffmail.com
Website : www. nityanandajanmasthan.com

প্রথম প্রকাশ— শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী। ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।
দ্বিতীয় সংস্করণ— শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী। ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।
তৃতীয় সংস্করণ— জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশী। (দণ্ডমহোৎসব তিথি)। ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
চতুর্থ সংস্করণ— জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশী। (দণ্ডমহোৎসব তিথি)। ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

-ঃ প্রকাশক ঃ-

পরতত্ত্ব প্রকাশন

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান। নিতাইবাড়ি। একচক্রা-গর্ভবাস।
বীরচন্দ্রপুর। বীরভূম-৭৩১ ২৪৫। পশ্চিমবঙ্গ। ভারতবর্ষ।
ফোন ঃ- ০৩৪৬১-২২০ ২২৪ / ২২০ ৩৫০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

(ক) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান। নিতাইবাড়ি। বীরচন্দ্রপুর। বীরভূম-৭৩১ ২৪৫।
(খ) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান সংরক্ষণী সমিতি । ৭৯বি, শোভাবাজার স্ট্রীট, কলকাতা - ৫
(গ) শহর-কার্যালয়। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান সেবামণ্ডল। সাহাপাড়া। পোঃ-রহড়া। কলকাতা-৭০০ ১১৮। দূরভাষ ঃ ০৩৩-২৫২৩ ৬৩৩২, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২৫২৩ ৬৪০৪
(ঘ) শ্রীমৎ মহেশ পণ্ডিতজীর শ্রীপাট। শ্রীশ্রীনিতাইগৌর মন্দির। পালপাড়া। ডাকঘর-চাকদহ। নদীয়া-৭৪১ ২২২।

মুদ্রণ— তপন কুণ্ডু। দমদম। কলকাতা - ৭০০ ০৩০

অক্ষর বিন্যাস— পরতত্ত্ব প্রকাশন।

বিনিময়— **দশ টাকা।**

শরণাগতের নিবেদন

পানিহাটিতে অনুষ্ঠিত দণ্ডমহোৎসবের প্রাণপুরুষ, ঘরের ঠাকুর নিতাইচাঁদের করুণায় এ গ্রন্থটি লোকলোচনে পুনঃপ্রকাশিত হ'লেন। নিত্যানন্দময় শ্রীগুরুদেব আর শ্রীগুরুরূপী নিত্যানন্দ, দুয়ের অভয়চরণে প্রণাম করছি নতমাথে—এই সুমঙ্গলকালে।

প্রকাশনক্ষণে বারবারই মনে পড়ছে হাবলা দাদার কথা। ইদানীং তিনি লোকান্তরিত হ'য়েছেন। তিনি এ রকম একটি ছোটখাট গ্রন্থের জন্য বারবারই প্রেরণা দিয়েছেন। গ্রন্থটি হ'লেনও। কিন্তু হাবলা দাদার (হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) চলে যাবার পর! এ দুঃখ রাখার স্থান নেই!! লেখনী হাতে বারবারই মনে পড়ছে তাঁর অনাবিল ভালবাসার কথা। আমায় দেখলেই ইদানীং উপচেপড়া হাসি নিয়ে বলতেন— "সেই হাফ প্যাণ্ট পরা জ্যোতি!" আমার দিক থেকে তাঁকে জানাবার কিছু নাই। সবই মিলে গেছে তাঁদের অহেতুক অনুগ্রহে। কেবল প্রার্থনা, যেন তাঁদের চরণে রতিমতি থাকে—"**করমবিপাকে গতাগতি পুনঃপুনঃ মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে।**"

লেখনী হাতে বারবার মনে পড়ছে পানিহাটির ব্রজেন গোঁসাইকেও। প্রভুপাদ ব্রজেন্দ্রমোহন গোস্বামী—ভাগবতরত্ন। তাঁর অপার্থিব স্নেহের কথা একমুখে বলবার নয়। তিনি ছিলেন আমার রথযাত্রা-পথের অভিভাবক। মনে পড়ছে মুকুন্দদাদার কথা। নাম ছিল—মানিকলাল মোদক। তখন উত্তরমুখো মন্দির ছিল। মুকুন্দদাদা ছিলেন সেবাধিকারী। শেষের দিকে তাঁর মেজাজ খুব খিট্‌খিটে হয়ে গেছিল। অতি অল্পেই চটে উঠতেন। তাহলেও স্নেহ করতেন আমায়। দেখা হ'লেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন আমার যাবতীয় সংবাদ। বাবাজী মহাশয়ের করুণাধন্য এই ভাগ্যবান পানিহাটিবাসীকে স্মরণ করছি, প্রণাম করছি।

কৈয়ড়ের গঙ্গাপিসিমা, অমূল্যকাকার বড় মেয়ে বীণাদিদি, হাবলাদাদার মা নিস্তারিণী ঠাক্‌রুন, ঘোষপাড়া যাবার পথে তারা-আলয়ের বৃদ্ধা মা আর ব্রজেন গোঁসায়ের দ্বিতীয় পক্ষের শাশুড়ী— সবাই-ই যেন রাঘব পণ্ডিতের সহোদরা দেবী দময়ন্তীর স্নেহকণা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদেরও প্রণাম।

দীনেশ কাকার কৃপায় জেনেছি, নবদ্বীপ জ্যেঠামশাই খুবই ভালবাসতেন পানিহাটিকে। অমূল্য কাকার সাথে তাঁর প্রথম দেখা, পুরাতন রাঘব ভবনের মন্দিরের বারান্দায়, তাও দূর থেকে। তখন জ্যেঠামশাই বারান্দায় বসে আছেন, আর সামনের সরকারী রাস্তা দিয়ে অমূল্যকাকা যাচ্ছেন তাঁর কর্মস্থলে। পরে উভয়ের মাঝে প্রণয় ঘনীভূত হ'য়েছিল। পানিহাটিতে চুরি করতে এসে চোর ধরা পড়েছে। জ্যেঠামশাই নিজে দায়িত্ব নিয়ে তাকে ছাড়িয়েছেন। তার জীবনের মোড় ঘুরে গেছে, নবদ্বীপচন্দ্রের ভালবাসায়। কটকের ছেলেদের মত পানিহাটির ছেলেরাও খুব ভালবেসেছে, জ্যেঠামশাইকে। সবারই তিনি ছিলেন "দাদা"। পানিহাটির "মৌচাক" সংঘের পাশেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ হরিসভায় বিরাজিত তাঁর মর্মরস্মারক দূর অতীতের সেই ভালবাসায় ভরা দিনগুলির সুবাস আজও, ছড়িয়ে দিতে চাইছে, আমাদের মনের মণিকোঠায়। পানিহাটির কথা লিখতে গিয়ে বারবার প্রণাম তাঁকে। তাঁর প্রীতে বলি—জয় শ্রীরাধারমণ।

যদিও এ নয়নে দেখিনি তবুও, **পানিহাটির কথায় সহজভাবেই এসে যায়, শ্রীরাধারমণৈকজীবন শ্রীমৎ অমূল্যধন রায়ভট্ট মহোদয়ের নির্বিকল্প নামটি। তাঁর লেখা "দ্বাদশ গোপাল", "বৃহৎ বৈষ্ণবচরিতঅভিধান", প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আলোড়ন এনেছিল তৎকালীন—গৌড়ীয় বৈষ্ণব গবেষক ও ঐতিহাসিক সমাজে। এই অক্লান্তকর্মা মানুষটি সবার অগোচরে, একান্ত নীরবে, অর্থ-সামর্থ বা**

কোনও প্রকার সহায়তাবর্জিত হয়েও বলবত্তর কালের বিধ্বংসী গ্রাস হতে বহু বহু অমূল্যনিধি সংগ্রহ করে আপন নামের যথার্থতা প্রতিপাদন করেছেন। এ বিষয়ে, তাঁর তুলনা তিনিই।

বড়বাবাজী মহাশয়ের (শ্রীরাধারমণদেব) সাথে তাঁর কখন-কোথায় দেখা হল জানিনা আমি, তবে সার্থক অনুমান করি, নবদ্বীপচন্দ্রদাসের সাথে অমূল্যধনের পরিচিতির পরিপাকেই, তিনি পরিচিত হয়েছিলেন রাধারমণদেবের সাথে—উড়িষ্যার শীতলকাকা আর জয়নগরের রাধানাথকাকার মতই। আর এই পরিচিতির বলেই উত্তরজীবনে তিনি চরমলক্ষ্যের পানে এগিয়েছেন বড়বাবারই একান্ত ভরসায়। তাঁর ব্যবহারিক আর পারমার্থিক, যাবতীয় খাতা-কাগজ আর সাধন-স্মরণের ওপরে প্রথমেই লেখা— "শ্রীশ্রীরাধারমণ" বা "শ্রীশ্রীরাধারমণ ভরসা"। **তাঁর জীবনের দিশারী শ্রীরাধারমণদেব তাঁকে সামনাসামনি বলেছিলেন—"কোনও ভয় নেই, ভাবনা নেই। হৃদয় সংকীর্ণ কোরো না। ব্যক্তিগত লক্ষ্য কোরো না। নিতাইচাঁদ কোনো অভাব রাখবেন না।" আর নবদ্বীপচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—"দীন হও। আবার দেখা হবে।" এই কথাগুলি মিলিয়ে মিশিয়ে এক করেই, অমূল্যধন আপন বুক বেঁধেছিলেন অপার সহিষ্ণুতা ও সেবাবোধে। একমাত্র পুত্রের অকালমরণেও হার মানেননি তিনি, পুত্রশোককে প্রবেশাধিকার দেননি অন্তরের অন্দরমহলে। সেই অমূল্যধন! সার্থকনামা একটি তন্ময় মানুষ। বারবার প্রণাম তাঁকে।**

এ প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ-ভগীরথপুরের অরুণদাদার কথা সতত স্মরণীয়। তিনি ছিলেন পানিহাটির শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের অকৃত্তিম বান্ধব। সার্থকনামা অমূল্যধন রায় ভট্টের যাবতীয় প্রাচীন বস্তু সংগ্রহ বিষয়ে ডান হাত—একান্তজন। কত যে সময় আর শ্রম তিনি ব্যয় করেছেন এই গ্রন্থমন্দিরের পরিপুষ্টির জন্য, তা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না! আজ তিনি কালগর্ভগত, বিস্মৃত, ষোলআনা উপেক্ষিত। তাঁর নামটুকুও কেউ জানে না। জানতে গেলে যে—পুরোনো ইতিহাসের প্রতি বুকভরা আন্তরিকতা আর গঠনমূলক চিন্তাধারার প্রয়োজন তার তো আঠারো আনারই অভাব! কেবল, বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়িতে বিরাজিত বর্ত্তমান শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থ মন্দিরের কোনও কোনও পুরাতন চিত্র বা স্মারকের— কোনও কোনওটির নিচে বিরাজিত তাঁর, বিবর্ণ আর ধূসর—অনেক আগে লেখা হস্তাক্ষর দেখে, জানাশোনা মানুষদের মনে পড়বে তাঁকে—ক্ষণিক।

১৩৮৭ বঙ্গাব্দের দণ্ডমহোৎসবে, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-জন্মস্থান সেবামণ্ডল হ'তে প্রকাশিত গ্রন্থসম্ভার নিয়ে বসেছিল ছেলেরা। সেই গ্রন্থ-বিপণিতে (BOOK STALL) অনেকেই খোঁজ করেছিলেন, দণ্ডমহোৎসব-বিষয়ক কোনও গ্রন্থের। সেই অভাবপূরণ করেছে এই দীন প্রকাশন।

পরপর তিনটি সংস্করণ হয়ে গেছে এই গ্রন্থের। পাঠকমহলের অকুণ্ঠ প্রশংসাও মিলে গেছে। এবার চতুর্থ সংস্করণ হোলো এই বইটির। প্রতিবারই প্রয়োজনীয় কিছু কিছু বিবরণাদি সংযোজিত হয়েছে, বইটিতে। অভিভাবকশ্রেণীর কেউ কেউ উপদেশে, সঠিক পথের দরজাটি, মেলে ধরেছেন, সামনে। লেখাও হয়েছে তাঁদের উপদেশ-অনুমত। তবুও বক্তব্য—সহৃদয় পাঠকগণ এ বইটি পড়ে যদি কোনও দোষ-ত্রুটি দেখতে পান, যদি কোনও অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে যায়, তা হলে তা দয়া করে পত্রে জানালে, পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেওয়া যেতে পারবে। যদি কোনও সংযোজনের প্রয়োজন বোধ হয়, জানালে তা সংযোজিত হবে পরবর্ত্তী সংস্করণে। জয় নিতাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী।
৩০ বৈশাখ। ১৪১৬ বঙ্গাব্দ। শরণাগত—শ্রীজীবশরণ দাস

উৎসর্গ

অরুণদাদার সাথে বয়সের ফারাক আমার বোধকরি ৫০/৫৫ বৎসর। অরুণকৃষ্ণ ঘোষ। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগীরথপুরে ঘর। চক-ইসলামপুরে কর্মস্থল। বহরমপুরে বিশেষ গতাগতি ''চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম খাদি সমিতি''র বাড়িতেই। বিশেষতঃ, গৃহস্বামী শ্রীনন্দকুমার চৌধুরী সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখতেন অরুণদাদাকে। নন্দকুমারের শ্রীগুরুদেব—শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ অধিকারী মহাশয়, ছোট ভাই বলে মানতেন অরুণদাদাকে। পালপাড়ার কেশবদাদার সাথে প্রথম বহরমপুরে গিয়ে জগন্নাথবাবুর জামাই, গোপীকৃষ্ণবাবুর বাড়ী হতে প্রথম নন্দকুমার চৌধুরীর বাসায়, অরুণদাদার সাথে আমার পরিচিতির সূত্রপাত ঘটে। তা ছড়িয়ে পড়ে মুখ্যতঃ হৃদয়দাদার নিজবাসে, আরবপুর-হরিপুরের (ডাকঘর-বাগচি জমসেরপুর) বাড়িতে, হৃদয়দাদার শ্রীগুরুদেব শ্রীমৎ নিত্যানন্দ দাস বাবাজী (হরিবোলা বাবা) মহাশয়ের তিরোভাব-স্মরণোৎসবে। সেখানে আমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগতদের সাথে সাথেই কয়েকদিন ধরে বিরাজ করতেন কত সাধু-বৈষ্ণব আর ঐ অঞ্চলের সুচিহ্নিত মহাজনেরা। অনাহূত-রবাহূতজনেদেরও মেলা! প্রভাতী কীর্ত্তনে আর সূচক স্মরণে চোখের জলের বান ডাকিয়েছেন কেচুয়াডাঙ্গার নিতাইদাদা .....। তাঁর সাথে আমার পরিচয়ের সূত্রধারও এই অরুণকৃষ্ণদাদাই। হরিপুরে ক'দিন ধরে কীর্ত্তন-নটনরঙ্গের পাশাপাশি যে স্নানরঙ্গ আর ভোজনরঙ্গের গায়ে গায়ে নিরন্তর প্রসঙ্গ-প্রবচনরঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে, তা অনুভব-নিধি! তারপরে মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে পালপাড়ায় নানা প্রসঙ্গে, আমার নিজজন হয়েছেন। তখন আমি কিশোর । স্কুলে পড়ি। ''পানিহাটির অমলদাদা'' বলতে অস্থির হতেন। উভয়ে একান্ত সহোদরের মতই ছিলেন। মুর্শিদাবাদ-ভগীরথপুরের জমিদার-গিন্নী বৃদ্ধা সুভাষিণী চৌধুরানীকে ''মা'' বলে ডেকেছিলেন অমূল্যধন রায় ভট্ট মশাই (অরুণ দাদার আন্তরিকতার ডাকে অমলদা)। যখন তিনি এসেছিলেন ভগীরথপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের প্রদর্শণী দেখাতে। আর অরুণ দাদাও ডাকতেন পূর্বোক্তা চৌধুরাণীকে, মা বলে। অমূল্য কাকার আদেশ পালনে তৎপর অরুণদা তখন হরদমই থাকতেন, পানিহাটিতে এসে। সেখানকার গ্রন্থমন্দিরের সেবা করেছেন খুবই। অনন্ত পরিশ্রম। অপরিমেয় কালক্ষেপ। তাও আবার দু পথ ধরেই এগিয়েছে তাঁর নিঃস্বার্থ সমান্তরাল সেবা কাজ। গ্রন্থমন্দির স্থানান্তরিত হবার পর, রায়ভট্ট মহোদয়ের অন্তেও যেতেন রাধারমণ কুঞ্জে। একবার হরিদাসজীর (হরিবোল কুটীর। পোড়াঘাট। নবদ্বীপ) সাথে পানিহাটি গিয়ে পথশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন। মরিচজল (গুড় আর গোলমরিচের সরবত) প্রার্থনা করায় দুহিতা কাঁচালংকাবাঁটা-জল দিয়েছিলেন। চরম গরমের দিনে হুড়মুড়িয়ে গালে ঢেলে হরিদাসজী আর অরুণদাদা উভয়েই, বিষম উদ্বেগে পড়েছিলেন। আমি তখন খড়দহে থাকি। খড়দায় এসেই অরুণদাদা সে কথা বলেছিলেন আমায়। তখনও তাঁর মুখের জ্বলুনি যায় নি। এরকম, অনেকের অনেক অহেতুক অনীহাই কুড়িয়েছেন সারাটি জীবন। তাও সেবা ছাড়েন নি। মটকার ঝোলা তৈরী আর বিতরণ, কণ্ঠী আর নামমালা গেঁথে দেওয়া, এ ছিল তাঁর দিনরাতের কাজ। যোগপীঠ এঁকে, দান করতেন। সাথে নিরন্তর প্রসঙ্গ। তাই নিয়েই ওপারে চলে গেলেন ললিতাসপ্তমীর শুভক্ষণে। অধুনাবিস্মৃত সেই অরুণদাদার হাতেই এ গ্রন্থ সমর্পণ করে কৃতার্থ হ'লাম। তাঁকে সাদর-প্রণাম। প্রার্থনা—বাঞ্ছিতলোক থেকে তিনি একটু তাকিয়ে দেখুন আমাদের।

ইতি—বিপথিক শ্রীজীবশরণ

শ্রীপাট পানিহাটি পরিচয় ও দণ্ডমহোৎসব

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের প্রথম নামপ্রচারপীঠ পানিহাটি, খুবই প্রাচীন গ্রাম। শিয়ালদহ-রাণাঘাট পূর্ব রেলপথের সোদপুরে নেমে একেবারে সোজা গঙ্গানদীতীরেই এই স্থান। সোদপুর রেল ষ্টেশন থেকে কিছু বেশি এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে। গা দিয়ে বয়ে চলেছে প্রসন্নসলিলা সুরধুনী। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাতীরে যে শ্রীপাটগুলি আজও বিরাজমান (পূর্বকূলে)—খড়দহ, সুখচর, আড়িয়াদহ, বরাহনগর—তাদেরই মধ্যমণি এই পানিহাটি। ব্যারাকপুর মহকুমায় এই স্থান। পতিতপাবনীর পূতপরশে এই ভূমি স্বতঃই পরম পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র। শ্রীচৈতন্যের চরণচিহ্নধন্য পানিহাটি ছিল সুসমৃদ্ধ জনপদ। চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায় জয়ানন্দের কলমে— "পানিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে। বড় বড় সমাজ সব, পতাকা মন্দিরে।।"

মুসলমান আমলে এ অঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্য খুবই উন্নত ছিল। অন্ততঃ হাজার বছরের পুরাতন এ অঞ্চলে, বড় বড় গুড়ের আড়ৎ ছিল বহু সংখ্যক। খেজুর গুড় আসত মুখ্যতঃ যশোহর ও খুলনা থেকে। ও অঞ্চলের (প্রধানতঃ যশোহর) ধানেরও প্রচুরতর আমদানি হোতো এই অঞ্চলে। যশোহরের "পৈনেটি" ধানের খুব নাম ছিল তখন। সেই ধান নৌকায় বয়ে নিয়ে এসে ফালাও ব্যবসা চলত এই পানিহাটিতে। তাই অনেকের মতে পন্যহট্ট থেকে পানিহাটি। আবার অনেকের মতে বহু বহু পুণ্যাত্মা সাধুসন্ত আর ভক্ত-সুজনের বাস ছিল এই সুরধুনীবিধৌত পুণ্যপীঠে আর পুণ্যহট্টই বিবর্ত্তিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল "পানিহাটি" অভিধায়। সত্যই, সেই কোন অনাদিকাল হতে এই স্থান আজও পুণ্যহট্টই—পুণ্যের হাটে মঙ্গলের পসরা নিয়ে আজও আগুয়ান। বিশেষ ভাঙ্গনের ছোঁয়া লাগেনি আজও, এই গঙ্গাতটস্থ গ্রামে, এত বছরেও। এ যেন বাংলার বারাণসী। পথিকের পুণ্যক্ষেত্র।

ভক্তসজ্জনসমাজে পানিহাটি সতত স্মরণীয়। গঙ্গাতটে যে স্থানে প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কৃপা-দণ্ড দিয়ে চিড়া-দধিমহোৎসবের আদেশ করেন, সেই স্থানটি অবিকল তেমনভাবেই এখনও বিরাজমান। এই লীলার সূত্রপাত হ'তেই স্থানটি মহোৎসবতলা—বা চলতি কথায়— মোচ্ছবতলা নামে আখ্যাত। এই পূত-পীঠের দিব্যদর্শনে কৃতার্থ হতে দীর্ঘ যুগ যুগ ধরে চলেছে ভক্ত-মেলা। যা আজও অবিরত, অব্যাহত, অমলিন। যে বটগাছের নিচে নিতাইচাঁদ, দাস রঘুনাথকে গৌরকরুণামৃতে অভিষিক্ত করেছিলেন, সেই গাছটি এখনও তেমনি ভাবেই রয়েছেন। সরকার হ'তে এখন এ বটগাছটির চারপাশ বাঁধিয়ে দেওয়া হ'য়েছে, গঙ্গাগর্ভের কিছুটা স্থানকে অধিকার ক'রে। গঙ্গার দিকে পেছন করে বাঁধানো বেদিমূলের চারপাশেই মর্মরফলকে কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ। পূর্বদিকে মুখ ক'রে, গাছটির কোলেই বিরাজিত একটি বেশ বড় মর্মরফলক—

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি

হে বন্ধু!
জান কি এ কোন পুণ্য স্থান!
অধন্য কলিরে যেহ ধন্য করিবারে
পরিপূর্ণ অবতারী স্বয়ং ভগবান
মূর্ত্ত ব্রহ্ম সত্য সনাতন
চিরঅনর্পিত প্রেম জীবে কৈলা বিতরণ
এই সেই শ্রীচৈতন্য-বিশ্রামের স্থান।
চরণচিহ্নিত ভূমি কর প্রণিধান
চরণচুম্বিতরজঃ করিয়ে চুম্বন
লুটাইয়া দেহ মনপ্রাণ
ত্রিতাপের তাপ জ্বালা কর নিবারণ
মৃন্ময়ে চিন্ময়সুখ লভ মতিমান্।

প্রসঙ্গতঃ বলতে পারি এ কবিতাটি শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রচিত। আর ব্যারাকপুর নিবাসী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সরকার এই স্তম্ভ (স্মারকটির) নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। এ কথা শুনেছি প্রবীণদের মুখে। সে ও তো অনেক দিনই হয়ে গেল!

পূর্ব মুখে রয়েছে আর একটি ছোট মর্মরফলক। এই দ্বিতীয় ফলকে লেখা—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব
৯২১ সালে (কোর্ত্তিকী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে)
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু
৯২৩ সালে এই বৃক্ষতলে
শুভাগমন করেন।
১/৭/১৩২১ বঙ্গাব্দ (ফলক স্থাপনের কাল)।

পূর্ব মুখে তৃতীয় ফলক—

শ্রীশ্রীমদনমোহন জয়তু

তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে। নিত্যানন্দ গোসাঞি পাশ চলিলা আর দিনে।।
পানিহাটী গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন। কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে, আর বহুজন।।

গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে। বসিয়াছেন যেন কোটি সূর্যোদয় ক'রে।।
কৌতূকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়। রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়।।
নিকটে না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে। আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিমু তোমারে।।
দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে। শুনি আনন্দিত হইল রঘুনাথ, মনে।।
এই মত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা। সবেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা।।
পানিহাটী গ্রামে হইল পরম আনন্দ। আপনি সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র।।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

এটির কাছেই বেদিমূলে, পূর্বমুখে চতুর্থ মর্মরফলকে নিবেদিত হয়েছে—

প্রেমের অবতার দয়ার সাগর
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক
১৪৩৮ শকে জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশীতে এই স্থানে
শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর কৃপাদণ্ডমহোৎসব লীলা।

পূর্ব দিক ছাড়াও এই সুপ্রশস্ত বৃক্ষবেদীমূলে, দক্ষিণমুখে বিরাজিত মর্মরফলকে লেখা রয়েছে ঃ
রঘুনাথ!

স্থির হইয়া ঘরে যাও না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধুকূল।।
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।।
অন্তরে শ্রদ্ধা রাখ বাহ্যে লোক ব্যবহার। অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।।

—মহাপ্রভু

পাশের ফলকটিতে ইংরজীতে লেখা—

THIS GHAT IS A RELIC OF THE
HINDU PERIOD. HERE LANDED
SRI CHAITANYA DEVA
FROM PURI IN
1514 A.D.

অন্তহীন লীলা-সাক্ষী তরুরাজের (মহৎ প্রাচীন বট গাছটির) পাদপীঠের সামনেই বাঁধানো নাটমন্দির। এ নাটমন্দিরের বয়স খুব বেশি নয়। এই দণ্ডমহোৎসব অঙ্গনে প্রবেশের দুটি দ্বার, এই দিব্যক্ষেত্রকে সামনের পাকারাস্তার(শ্রীগৌরাঙ্গ ঘাট রোড) সাথে যুক্ত করেছে।

দণ্ডমহোৎসব-অঙ্গনের একপাশে শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির। বর্ত্তমানে পূর্ব মুখে অবস্থিত। এই মন্দির আগে আরও স্বল্প পরিসর এবং উত্তরমুখী ছিল। মন্দির সংলগ্ন অঙ্গনে প্রবেশের প্রথম দ্বার দিয়ে ঢুকতে হাতের ডানে লেখা—

দণ্ডমহোৎসবতলা

সেবাইত—শ্রীজীবনকৃষ্ণ রায়চৌধুরী

হাতের বামে লেখা—

প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃপা
বলিষ্ঠ সবা হইতে।
তোমারে কাড়িল বিষয়
বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে।।

তরুরাজ-বরাবর, অঙ্গনে প্রবেশ দ্বারে ঢুকতে হাতের ডানে লেখা—

রঘুনাথ!
...... চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোরে করিমু দণ্ডন।।

—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ।

ওঁ

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।।

হাতের বামে লেখা— **তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।**
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি।।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ঘাট

এ দণ্ডমহোৎসব অঙ্গনের সন্নিহিত মন্দিরের পাশের দিকে, অঙ্গনলগ্ন দরজার মাথায় লেখা আছে—

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির।

এই উত্তরমুখো দরজাই আগে এ মন্দিরে প্রবেশের একমাত্র পথ ছিল—যখন মুকুন্দ দাসজী (মানিকলাল মোদক) এই মন্দিরের সেবক ছিলেন। তাঁর স্মৃতিফলক রয়েছে এ দরজার পাশেই।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপ্রার্থী শ্রীমুকুন্দদাস বাবাজীর(মানিকলাল মোদক) পুণ্যস্মৃতিকল্পে—মাধাই মোদক। পানিহাটী। ইং-১৯৭৯।

বর্ত্তমানে এই দেবমন্দিরের মুখ্য দ্বারের উপরে লেখা—

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মন্দির।

মুখ্য দ্বারের বামে, (দর্শকের ডানে) লেখা রয়েছে, মন্দিরের গায়ে—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যঃ বৈষ্ণবেভ্যঃ নমোনমঃ।।

মুখ্য দ্বারের ডানে, (দর্শকের বামে) রয়েছে প্রণিধানযোগ্য স্মৃতিফলক, মন্দিরেরই গায়ে—

ভগবান গৌরাঙ্গদেবের পানিহাটীবাসী শিষ্যগণের পুণ্যস্মৃতি

১। শ্রীল রাঘব পণ্ডিত

২। শ্রীমতী দময়ন্তী দেবী

৩। শ্রীল মকরধ্বজ কর

৪। শ্রীল মোহন ঠাকুর

৫। শ্রীল পুরন্দর পণ্ডিত

৬। শ্রীল কাশী মিশ্র

৯২৩ সালে বিদ্যমান।

এই স্মৃতিফলকটি পূর্বে বটতলার দক্ষিণ-পূর্বাংশে রামচাঁদ ঘাটের উপরে উত্তরপাশে বাঁধানো একটি স্থানসংলগ্ন ছিল। পরে এটি বর্ত্তমান জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

এ মন্দিরের পেছনে দিয়ে বয়ে চলেছে উছলিতা সুরধুনী। মন্দির ও তরুরাজ, এর মাঝেই নৌকাযোগে পানিহাটিতে এসে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তরুতলে অবতরণ স্থান—গৌরাঙ্গঘাট। এটি ছাড়াও দুপাশে দুটি চওড়া স্নানের ঘাটও রয়েছে।

এ মন্দিরের সামনেই, পথের উপরে জটিলেশ্বর শিবালয়। তার প্রায় পেছনেই একটি একতলা ঘরের গায়ে লেখা রয়েছে—**বৈষ্ণব স্মৃতি সমিতি** ।

বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দিরটি স্বল্প পরিসর। তবে আগে মুকুন্দদাদার সময় অপেক্ষা এখন যেন একটু অধিক পরিসর, বোধ হয়। পাশে একটু ছোট ঘরও আছে । এই শ্রীমন্দিরের সিংহাসনে বহু বহু দেবদেবী আর শিলা-চক্রের সম্মেলন। সিংহাসনটির তিনটি বিভাগ ধরলে, মধ্য বিভাগে—নটনপর নিতাইচাঁদ ও ষড়ভুজ মহাপ্রভু। মহাপ্রভুর বাম দিকে একটু পেছন ক'রে গদাধর পন্ডিতের অপেক্ষাকৃত ছোট বিগ্রহ বিরাজমান। নিতাইচাঁদের ডানের প্রকোষ্ঠে— শ্রীবলদেব, সুভদ্রা ও জগন্নাথ। আশেপাশে গণেশের একাধিক মূর্তি , বহু শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম প্রভৃতি ঠাকুরগোষ্ঠী যেন দিনে দিনে বাড়ছেন। ষড়ভুজ মহাপ্রভুর বামে, আলাদা বিভাগে ...... শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগল। সিংহাসনের নিম্নভাগে —শ্রীগুরুবর্গ বিরাজমান। একদম ডানে শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের(শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়) প্রমাণ বিগ্রহ। পাশেই পানিহাটীর অমূল্যনিধি—সার্থকনামা শ্রীমৎ অমূল্যধন রায় ভট্ট মহোদয়ের চিত্রপট। এঁর পাশেই শ্রীপাদ বড় বাবাজী মহাশয়ের (শ্রীরাধারমণ দেব) চিত্র। রাধারমণের বামে বাবাজী মহাশয়। বাবাজী মহাশয়ের বামে শীতলকাকার (শ্রীমৎ শীতলচরণ দাস বাবাজী মহাশয়) চিত্রপট। এ ঘরে

বিরাজিত বহু বহু প্রাচীন ও নবীন মহাত্মাগণের চিত্রপটে চারিদিকের দেয়াল সমাকীর্ণ।

দণ্ডমহোৎসব-অঙ্গনের একপাশে একটি স্মৃতিফলক বসেছে ১/৪/১৯৮১ তরিখে। তাতে দেখা যায় এ অঙ্গনের নবীন রূপায়ণের উদ্বোধক—পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় সেচমন্ত্রী মহোদয়।

দেহমন লুটিয়ে প্রণাম করে, এ অঙ্গন হ'তে বাহির হ'লে হাতের বামে, পাশে শ্রীগৌরাঙ্গঘাট রোডের উপরেই—সেনদের ঠাকুরবাড়ী। বেনেদের ঠাকুরবাড়ীও বলে। নাম—শ্রীগৌরাঙ্গ ধাম। এ বাড়ীর প্রবেশপথের মুখেই বৈঠকখানা ঘরে বিশ্রাম করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। যে ঘরে তিনি বিশ্রাম করেছিলেন, তার বাহির দেওয়ালেই দেখা যায় পরিচিতি-ফলক। দরজার বামে লেখা রয়েছে—

ওঁ

অমৃত তীর্থ

পানিহাটী

ডানে লেখা—

ওঁ

এই গৃহে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শুভ পদার্পণ করেছিলেন।

এ বাড়ীর ভিতর দেবালয়ের অঙ্গনের একপাশে স্মৃতিফলক। যার মর্মার্থ ১৮ই জুন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দণ্ডমহোৎসবে সপার্ষদে যোগদান ও মণিমাধব সেনের ঠাকুরবাড়ীতে শুভ আগমন।

সেনেদের ঠাকুরবাড়ী গৌরাঙ্গধামের শ্রীমন্দিরে তিনটি প্রকোষ্ঠ। মাঝে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ। আগে এ বিগ্রহযুগলের হাতে দুটি ছোট ছোট কমণ্ডলু দেখা যেত। এখন আর নেই। এই সিংহাসনের প্রথমটিতে লক্ষ্মীনারায়ণ, দ্বিতীয়ে শিলাবিগ্রহ। সর্বদক্ষিণের প্রকোষ্ঠে বলাইচাঁদ ও রেবতী। বামের প্রকোষ্ঠে রাধাকৃষ্ণ। গোপালও আছেন। এই রাধাকৃষ্ণই এঁদের আদি ঠাকুর। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গুরুচরণ সেন। ইনি কলকাতার—বিখ্যাত তুলাপট্টির (Cotton Street) রামনারায়ণ সেনের উত্তরপুরুষ। অন্য বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠা করেন মণিমাধব সেন।

নিতাইগৌর ও রাধাকৃষ্ণের সিংহাসনের মাঝে বড়সড় মর্মরময় মহাবীর হনুমানের শ্রীবিগ্রহ। আর নিতাইগৌর ও রেবতী-বলরামের সিংহাসনের মাঝে মর্মরময় চতুর্ভুজ একটি শ্রীবিগ্রহ। এঁরা বলেন সত্যনারায়ণ। মূর্ত্তিটির চারটি হাতের মধ্যে ডানদিকের উপরের হাতে (বোধহয়) সাপ। ঐ দিকে নিচের হাতে—অক্ষমালা। বাম দিকে উপরের হাতে কমণ্ডলু। ঐ দিকে নিচের হাতে বেদ গ্রন্থ (সম্ভবতঃ)। এ বিগ্রহের পাদপীঠের নিচে একটি প্রাণীর মূর্ত্তি আঁকা আছে। বেজির মত ঝাঁকড়া লেজ। চতুষ্পদ। ইঁদুর নয় বলেই মনে হ'ল। কুকুর হ'তে পারে। এটি কি শ্রীবিগ্রহের বাহন? রং হলুদ। কাঠবিড়ালী?

সামনেই তুলসীমঞ্চ। এ অঙ্গন বহু বহু মহতের পদরজপূত। এ অঙ্গনের বিপরীতে, শ্রীগৌরাঙ্গঘাট রোডের ওপারে—গৌরাঙ্গধামের সামনাসামনিই সুপ্রশস্ত গঙ্গার ঘাট। ঘাটে নামতে নামতে ডানে. কোণের দিকে একটি ছোট্ট মন্দিরে—মর্মরময় প্রণববিগ্রহ (ওঁ) প্রতিষ্ঠিত। উপরে লেখা আছে ওঁ মা। নিচের দিকে পূর্বমুখে লেখা রয়েছে—

মা

সন্ধ্যা হ'ল বুকে ধর
অতল কালো স্নেহের মাঝে
ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর।

দক্ষিণমুখে লেখা রয়েছে—

ওঁ

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘন তটবিপ্লাবিনি ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে!
কত নগ নগরী তীর্থ হইল, তব চুম্বি চরণ যুগ মায়ি!
কত নরনারী ধন্য হইল মা, তব সলিলে অবগাহি!
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি,
করি সুশ্যামল কত মরুপ্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে।
পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
নারদকীর্ত্তনপুলকিতমাধব বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু উছলি, ধূর্জটিজটিলজটাপর ঝরিয়া
অম্বর হইতে সম শতধারা জ্যোতিপ্রপাত তিমিরে
নামি ধরাতলে হিমাচলমূলে মিলিলে সাগর সঙ্গে।।
পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা! শয়িত অন্তিম শয়নে
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব মা! বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিতপ্রাণে বরিষ অমৃত মম অঙ্গে।
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি, সুরধুনি কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

এ স্থান মহোৎসবতলার বামে। ডানে গঙ্গার ধারে ধারে সামান্য এগিয়ে, বাঁয়ে গলির মধ্যে অমূল্য কাকার (শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট) বাড়ি। ছোটখাট দোতলা বাড়িটি এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। দোতলাটি ভেঙ্গে গেছে অনেক আগেই, যার বারান্দায় কাঁচা সিমেন্টের মেঝের উপরে ছিল অমূল্যধন রায় ভট্ট মহোদয়ের দুটি পায়ের ছাপ। ইদানীং একতলাও বিধ্বস্ত। পাশে কোনওরকমভাবে বাস

করছেন গৃহস্থরা। একতলার ছোট ঠাকুরঘরও একেবারে নষ্ট হয়ে যাবার মুখে। ছোট প্রবেশ দ্বারের মুখেই মর্ম্মর ফলক—

পানিহাটী

শ্রীরাধারমণ কুঞ্জ

ও

শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির।

দরজার অপর পাশে অমূল্যকাকার বাবা ও মায়ের (বাবুরাম রায় ও শশীমুখী দেবী) স্মৃতিফলক। এই সদর দরজামুখো, ঠাকুরঘর। সিংহাসনে নিতাইগৌরের বড় চিত্র। গৌর মুণ্ডিতমস্তক। নিচে ছোট পেতলের সিংহাসনে দাদামহাশয়ের (শ্রীরাধারমণদেব) বিগ্রহ। বাবাজী মহাশয় ও বড় বাবাজী মহাশয়ের চিত্রপটসেবাও আছেন। পাশে অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়ের চিত্রও বিরাজিত। নিতাইগৌরের চিত্রের বামে একমূর্ত্তি মহাপ্রভুর দাঁড়ানো ভাবাবিষ্ট চিত্রপট। এই চিত্রের অনুরূপ চিত্রই পানিহাটী হ'তে বরাহনগরে যান—নৌকাযোগে। তবে সেটি অপেক্ষাকৃত বড়। বামে একমূর্ত্তি বেণুধর শ্রীকৃষ্ণের খণ্ডিত মণিময় বিগ্রহ। নির্ভরযোগ্যসূত্রে শুনেছি এ বিগ্রহ খণ্ডিত হওয়ায় গঙ্গায় দেওয়া হয়। রায় ভট্ট মহোদয় তুলে এনে রক্ষা করেন। এহো বাহ্য ....। ভিতরের কথা আরও কিছু আছে .....। শ্রীমন্দিরের বারান্দার সংলগ্ন, পানিহাটীবাসী মকরধ্বজ করের স্মৃতিসমাধি। ফলকে লেখা আছে—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ হরি

গৌরপরিকর

পানিহাটীবাসী শ্রীল মকরধ্বজ করের স্মৃতিসমাজ।

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর। যাঁর এক প্রিয় শাখা মকরধ্বজ কর।।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু

শ্রীরাঘব পণ্ডিত

শ্রীমকরধ্বজ কর

মকরধ্বজ কর বন্দো গুণেরি নিধান। প্রভুস্থানে কৃষ্ণগুণ সদা যাঁর গান।।

আবির্ভাব ১৪০০ শকে

১৩৫৪বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে এই ফলক প্রতিষ্ঠিত। পাশে বিষ্ণুর অনন্তশয্যা ও রাধাকৃষ্ণের মণিময় ফলক। অলোকসুন্দর ভাস্কর্য। কাছে একটি নৃসিংহ মূর্ত্তি। মকরধ্বজ করের স্মৃতিফলকের প্রায় বিপরীতে—অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়ের স্মৃতি সমাধি। ভিতরে রায়ভট্ট মহোদয়ের চিত্র। শ্রীরাধারমণদেবের ছোট বিগ্রহ। পঞ্চম দোলে রায়ভট্টমহাশয়ের স্মরণবাসর।

এ অঙ্গনে তুলসী মঞ্চের আকারে—অভিরামগোপালের শিষ্য বেদগর্ভ গোস্বামীর বংশীয়, বর্দ্ধমান

জেলাস্থ শ্রীপাট কৈয়ড় নিবাসী শ্রীরাধিকাচরণ গোস্বামীর স্মৃতিসমাজ।

বর্ত্তমানে কলকাতার বরাহনগরে বিরাজিত শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে আমরা যে সকল বহু বহু প্রাচীন ভাস্কর্য, পুঁথি, স্মৃতিচিহ্ন, লিপি, চিত্রাদি দর্শন করি, এগুলি ছিল এই রাধারমণ কুঞ্জের শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে। রায় ভট্ট মহোদয়, তাঁর সারাজীবনের সংগ্রহাদি পাঠবাড়ীতে দান করে সার্থকনামা হ'য়েছেন। তবে নির্ভরযোগ্যসূত্রে শুনেছি এহতে সরে গেছে বহুতর স্মৃতিচিহ্নআদি। অমূল্যকাকার দুই মেয়ে, বীণাপানি ও সাবিত্রী দেবী এবং সাবিত্রীদেবীর স্বামী অধরচন্দ্র রায়ের হস্তক্ষেপেই ঘটেছে এসব। কিছু গেছে চন্দননগরে, নিতাই রায়ের বাড়িতে।

ঋষিকল্প পূণ্যব্রত অমূল্যধন, শুদ্ধা সরস্বতীর অনুগ্রহে, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সাহিত্যসেবায় আজীবন একান্তব্রতী ছিলেন। বিভিন্ন প্রাচীন পত্রিকায়, বিশেষতঃ **"শ্যামসুন্দর" "ভক্তি" "গৌরাঙ্গ সেবক" "গৌরাঙ্গ মাধুরী"** প্রভৃতি সাহিত্যপত্রে তাঁর গবেষণাপুষ্ট বহু প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। স্বরচিত "বৈষ্ণব অভিধান" "দ্বাদশ গোপাল" প্রভৃতি গ্রন্থেও তিনি তাঁর প্রাতিভ বিকাশের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রবন্ধগুলি অনুশীলন করলে সহৃদয়জন অনুভব করবেন সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কি ভাবে তিনি বৎসরের পর বৎসর ঘুরে ঘুরে, নতুন নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন। একমাত্র পুত্রের বিয়োগেও তিনি মূহ্যমান হন নি। নিজের সেবায় অটল থেকেছেন।

মূল প্রসঙ্গে আসি। শ্রীরাধারমণ কুঞ্জ হ'তে বেরিয়ে, দণ্ডমহোৎসবতলা পার হ'য়ে সামান্য দূরেই রাঘবভবন। অঙ্গনে ঢুকতে হাতের বামে মাধবীলতা গাছটি বিরাট চত্ত্বর জুড়ে, ছায়াসুনিবিড় শন্তির নীড় গড়ে তুলেছে। প্রশস্ত মন্দিরে, সিংহাসনে বিরাজিত দুই যুগল মদনমোহন আর রাধামোহন। উভয় বিগ্রহই কৃষ্ণমণিময়, উভয়ের ঠাকুরাণীই ধাতুময়ী। সিংহাসনের ডান দিকের ঠাকুরই মদনমোহন। ইনি শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সেবিত। প্রাচীন অনেকের কাছে শুনেছি, অনিবার্যকারণে, রাঘবের সেবিত মূল বিগ্রহ খণ্ডিত হন এবং তা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জিত হলে, বর্ত্তমান প্রতিনিধি মদনমোহনকে, সেই স্থলাভিষিক্ত করা হয়। পূর্ব-আলোচিত রাধারমণ কুঞ্জে বিরাজিত খণ্ডিতচরণ একক কৃষ্ণবিগ্রহটিই মূল মদনমোহন বিগ্রহ।

গর্ভমন্দিরের মুখ্য দ্বারের উপরে, দেওয়ালে লেখা রয়েছে—

রাঘব পণ্ডিতের প্রাণ। নিতাই রাধা গৌর শ্যাম।।

সিংহাসনের অপর যুগলের নাম শ্রীরাধামোহন। রাঘব ভবনের পুরাতন মন্দির ছিল অনেকখানি উঁচু। কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করে তৎকালীন মন্দিরের বারান্দায় উঠতে হোত। বারান্দা হ'তে দেখেছি— মদনমোহনের বামে, অপেক্ষাকৃত নিচু, স্বতন্ত্র সিংহাসনে ঘরের একেবারে বামে, কোণের দিকে এই বিগ্রহযুগল বিরাজ করতেন। এখন দুই যুগল সিংহাসনেই আছেন পাশাপাশি। নিচে শ্রীরাধারমণগণের অনেকেরই বড় ও ছোট চিত্রপট বিরাজমান। সবার ডানে ইদানিং বসেছে রাঘবপণ্ডিতের একটি মূর্ত্তি। এটি একান্ত নবীন। মূর্ত্তির গায়ের রং দেখছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ। এর সঠিক কারণ বুঝলাম না। রাঘব

পণ্ডিতের গায়ের রং এই রকম একথা কোথাও লেখা আছে কি? এত কালো? তা হলে? আগে নাটমন্দির ছিলেন না। এখন মন্দিরের সরাসরি প্রশস্ত নাটমন্দির হয়েছেন। সর্ব্বৈব সংস্কার ও নতুনভাবে সব তৈরি করা হয়েছে। প্রাচীন স্মৃতি এখন সম্পূর্ণ লুপ্ত। সেই ঘরদোরের বিন্দুমাত্র অবশেষও নাই। মন্দিরের পাশেই রান্নাঘর। দেওয়ালে লেখা—"**রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা ঠাকুরাণী**"। সমকালীন শাস্ত্র-সাহিত্যে পরম ভক্তপ্রবর রাঘবের যশের অন্ত নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেন—

রাঘব পণ্ডিতে কহেন বচন সরস। তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি হই তোমার বশ।।
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্বজন। পরম পবিত্র সেবা অতি সর্বোত্তম।।
নিত্যানন্দ নর্ত্তনে শ্রীরাঘবভবনে। নিত্য মোর আবির্ভাব শুন ভক্তগণে।।
প্রভু বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া। পাশরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া।।
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়। সেই সুখ পাই আসি রাঘব আলয়।।

রাঘবের সেবাবুদ্ধি বাক্যের পার। গ্রন্থে পাওয়া যায়—বারো যোজন পথ ভেঙ্গে, পছন্দসই নারকেল এনে রাঘব, মহাপ্রভুর সেবা করেছেন। ব্রজলীলার ধনিষ্ঠা সখী, গৌরলীলায় রাঘবপণ্ডিত, স্বয়ং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য। তাই বড় ভালবাসতেন তাঁকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু। তাঁকে কৃপা করে মহাপ্রভু নিজ গোপ্যকথায়, নিতাই-মহিমা জানিয়েছেন—

রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর। নিভৃতে কহিলা কিছু রহস্য উত্তর।।
শুন রাঘব আমি তোমায় নিজ গোপ্য কই। আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যনন্দ বই।।
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন মোরে। সেই আমি করি ইঁহা বলিল তোমারে।।
আমার সকল কর্ম নিত্যানন্দ দ্বারে। এই আমি অকপটে কহিল তোমারে।।
তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে দ্বেষ যার রহে। সতত ভজিলেও সে মোর প্রিয় নহে।।
গোপীগণের যেই প্রেমা কহে ভাগবতে। একা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে।।
মহাযোগেন্দ্রেরও যাহা পাইতে দুর্লভ। নিত্যানন্দ হইতে তাহা হইব সুলভ।।
এতেকে হইয়া সভে মহা সাবধান। নিত্যানন্দ সেবিহ—যে হেন ভগবান।।
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই। তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই।।
স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়। নিতাই পারে হেন কৃষ্ণে করিতে বিক্রয়।।
প্রভু কহে এই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে। যে করয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা সে করে আমারে।।
ইঁহার চরণ শিব ব্রহ্মার বন্দিত। অতএব ইঁহারে করিহ সভে প্রীত।।

অভিরাম দাসের "পাট-পর্যটন" গ্রন্থে আছে—"পানিহাটী গ্রামে রাঘব-দময়ন্তী ধাম। রাঘবের ঝালি বলি আছয়ে আখ্যান।।" আবার দেখি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে রাঘবকে মহাপ্রভুর শাখায় গণনা করা হ'য়েছে। এ গ্রন্থের অন্ত্য / দশমে তাঁর ঝালির বর্ণনা আছে—

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর। তাঁর এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ কর।।
তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী। প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বার মাসি।।
সে সব সমগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া। রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া।।
বার মাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার। রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার।।
অপরূপ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ। বৎসরেক প্রভু যাহা করেন উপভোগ।।
আমকাসুন্দি, আদাকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি আর। নেবু আদা আম্রকোলি বিবিধ প্রকার।।
আমসি আম্রখণ্ড আর তৈলাম্র আমতা। চূর্ণ করি দিয়াছেন পুরাণ শুকুতা।। ◆
শুকতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিতে। শুকতায় যে প্রীতি প্রভুর, নহে পঞ্চামৃতে।।
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়। সুক্তাপাতা কাসুন্দিতে মহাসুখ পায়।।
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়। গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায়।।
শুকতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ। এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস।।
ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া। লাড়ু বাঁধি দিয়াছেন চিনি পাক দিয়া।।
শুণ্ঠিখণ্ড লাড়ু হয় আমপিত্ত হর। পৃথক পৃথক বাঁধা আছে কুথলি ভিতর।।
কোলি শুণ্ঠি, কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর। কত নাম লব শত প্রকার আচার।।
নারিকেলখণ্ড আর লাড়ু গঙ্গাজল। চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার দিয়াছেন সকল।।
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার। অমৃতকর্পূর আদি অনেক প্রকার।।
শালিকাচুটি ধান্যের আতপ চিড়া করি। দিয়াছেন বড় বড় কুথলিতে ভরি।।
কতক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া। চিনি পাকে লাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া।।
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস। চূর্ণ করি লাড়ু কৈল পরম সুবাস।।
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল। চিনি পাকে কর্পূরাদি দিয়া লাড়ু কৈল।।
কভু নাহি জানি নাম এ জন্মে যাহার। ঐছে নানা দ্রব্য দিল সহস্র প্রকার।।
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া। পাপড়ি করিয়া দিল গন্ধ দ্রব্য দিয়া।। ✱
কহিতে না পারি নাম কতেক প্রকার। দিয়াছেন দময়ন্তী প্রীতি-উপহার।।
এত বলি রাঘব পণ্ডিত ঝালি সমর্পিল। ভোজনগৃহের কোণে গোবিন্দ রাখিল।।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নাথ শ্রীগৌরহরি, সর্বেশ্বরেশ্বর, সর্বশক্তিমান, যাবতীয় বিকার-রহিত। কিন্তু রাঘব-দময়ন্তীর তাঁতে শুদ্ধ বাৎসল্য। সেই বাৎসল্যের বশেই "দময়ন্তী মনুষ্যবুদ্ধি করে প্রভুর পায়।" সেই শুদ্ধ অভিমানেই যেমন একদিকে প্রভুর প্রীতিজনক মুখোরোচক বিবিধ দ্রব্যের বেসাতি, অপর দিকে তেমনি অসময়ে খেয়ে দেহ অসুস্থ হ'য়ে পড়তে পারে—এই আশঙ্কায় প্রভুর দেহকে সুস্থ রাখার

◆ পুরানো তেতো পাটের পাতার গুঁড়ো। শোনা যায়, এই গুঁড়ো আমাশার অব্যর্থ ঔষধ।
✱ শৌচাদির পর হাতমাটির জন্য।

অনুকূল চেষ্টা তথা ব্যবস্থা-বিধান নিহিত রয়েছে সুকতাপাতার গুঁড়ায়।

রাঘবভবনে মাধবীকুঞ্জ বড় মধুর। শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় এই মাধবীকুঞ্জেই খুঁজেছেন তাঁর প্রাণকোটি প্রিয়তমকে। রাঘবকে সম্বোধন করে বাবাজী মহাশয় কেঁদেছেন—"এই তো মাধবীকুঞ্জ! তোমার প্রাণের নিতাই ল'য়ে কোথা লুকায়ে ব'সে আছ?" শুধু তাই নয়—মাধবীলতা প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে বাবাজী মহাশয়ের শরণাগতিতে—"বল বল মাধবীলতা! আমার নিতাইসুন্দর আছে কোথা?" গঙ্গাতীরে, সেদিনের সেই লীলাবলীর নির্বাকসাক্ষী তরুরাজের পাদপীঠে বাবাজী মহাশয়ের প্রেম-রসোদ্‌গাররের শুভারম্ভ। তাঁর ব্যকুলতা চরমে উঠেছে, ইষ্টঅন্বেষণে মাধবীকুঞ্জ অবধি এসে। ভাবসম্মিলন ঘটেছে রাঘবের ঘরে। প্রাপ্তির পরানন্দে তলিয়ে গেছেন বাবাজী মহাশয়, রাঘবের মন্দিরদ্বারে—সেখানেই গৌরপ্রেমের অথৈ বানে সব একাকার হ'য়ে গেছে। বাবাজী মহাশয়ের ভাবনেত্রে তখন অনুরাগরাজ্যে নিত্যনন্দ-তন্ময়তা। সবসময় সব কথা, ব'লে বোঝানো যায় না। কথা যে রাজ্যে পৌঁছায় না—অনুভব হয়ত কিছু খবর দিতে পারে, সেই রাজ্যের। তেমনি অনুভব-পীঠ এই রাঘবভবন। বর্ত্তমানে, **রাঘব ভবনেই পানিহাটি বৈষ্ণব স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি অবস্থিত**। শ্রীপাটের প্রচার প্রসার, প্রয়োজনীয় সৌষ্ঠব সংরক্ষণ—এসব দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি। ভবনের পাশে নতুন তৈরি একটি ঘরে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও নিতাইচাঁদের আলেখ্য ও চরণচিহ্ন রয়েছে। দেওয়াল জুড়ে ঝালি নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। পাশে দময়ন্তী দেবীর মূর্ত্তি। বঁটির উপরে বসে কোনও সব্‌জি বা ফলকে (আম প্রভৃতি) সেবার উপযোগী করে, সংস্কার করছেন। সামনের আলমারিতে, রাঘবের ঝালিতে বর্ণিত নাড়ু-বড়ির প্রতিরূপ। দেখে উদ্দীপন হ'বে। নির্মাতা, তাঁর এই নূতনতর চেষ্টার জন্য নিশ্চয়ই গৌরজনের আশীষভাজন হ'বেন নিঃসন্দেহে। রাঘব ভবনের বেড়া-প্রাচীরের বাইরে রয়েছে ঠাকুরের রাসমঞ্চ। ইদানীং সংস্কার হ'য়েছে। দোলে-রাসে ঠাকুর আসেন এখানে। কিছু দূরে, রাঘবের পরমপ্রিয় সেবক **মকরধ্বজ করের ভিটায় রয়েছে বড় হরিসভা**। পানিহাটি হ'তে সুখচরে, গোবিন্দ দত্তের শ্রীপাটে যাবার পথে, হাতের বামে এই স্থানটি। মকরধ্বজের কথা সামান্যভাবে আগেও বলা হ'য়েছে। রাধারমণকুঞ্জে তাঁর স্মৃতিসমাধি রয়েছে। এঁর আবির্ভাব ১৪০০ শকে। ইনি রাঘব পণ্ডিতের প্রিয় শিষ্য। গুরুদেবের অনুগত হ'য়ে, তাঁর ইচ্ছাপূরণই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। শাস্ত্র বলেন—"গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্বধর্মোত্তমোত্তমম্।" মকরধ্বজের চরিত্রে আমরা দেখি এ পংক্তির সমুজ্জ্বল অনুভবসিদ্ধি। গুরুর আরদ্ধকর্মকে পরিপূর্ণতা দিতে তিনি অনন্য। ঝালি নিয়ে যাবার সময় তিনিই থাকতেন মৌসিন অর্থাৎ রক্ষক বা তত্ত্বধায়ক। চৈতন্যচরিচামৃত (অন্ত্য/১০) বলেন—

ঝালির উপর মৌসিন মকরধ্বজ কর। প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর।।

কায়স্থকুলগৌরব কর মহাশয় কৃষ্ণলীলায় ছিলেন ব্রজের নট—চন্দ্রমুখ। শিবানন্দ সেনের পুত্র—কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় (১৪১) এ প্রসঙ্গ বর্ত্তমান। ইনি মহাপ্রভুর বিশেষ করুণার পাত্র। মহাপ্রভু, পানিহাটি রাঘব ভবনে এলে কর মহাশয় তাঁর শুভদৃষ্টিপথে পতিত হ'ন। মহাপ্রভু,

মকরধ্বজকে অশেষবিশেষে, তাঁর শ্রীগুরুদেব রাঘব পণ্ডিতের সেবা করতে বলেছিলেন।

মকরধ্বজ কর প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্র। বলিলেন "সেবিহ রাঘবপদদ্বন্দ্ব।।
রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার। সে কেবল সুনিশ্চয় জানিহ আমার।।"

মকরধ্বজের কোনও বংশলতার চিহ্ন এখন আর শ্রীপাট পানিহাটিতে নাই। মকরধ্বজের কোনও সমাধিপীঠও নাই। তবে বিশ্বেশ্বরকৃত "কায়স্থ-কুল-দর্পণে" পানিহাটির কর-কায়স্থদের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। তাঁরা মকরধ্বজের বংশীয় হ'তে পারেন। পুরাতন "গৌরাঙ্গসেবক" পত্রিকায় দেখা যায়, মকরধ্বজের বংশধারা, মাগুরা-মৃজাপুরের 'করধামে' বিদ্যমান। **মকরধ্বজ করের বাস্তুভিটা এখন বড় হরিসভা নামেই খ্যাত**। রাস্তার উপর হ'তে, এই হরিসভার চিহ্নিত ভক্তদ্বয়ের স্মৃতিফলক নজরে আসে। দক্ষিণে ঠাকুর সরোজকুমারের মধুস্মৃতি। সুপরিসর ফলকে লেখা—

(ভজ) নিতাই গৌর প্রাণারাম। (জপ) হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

মধুর গৌরধামগত ঠাকুর সরোজকুমারের মধুস্মৃতি।

এর নিচে একটি রক্তিমাভ শতদল—যেন পূর্ণায়ত ভক্তিপদ্ম। তার নিচে লেখা রয়েছে—

ভাসালেন যিনি এ মরু ধরায় নিতাইপ্রেমের বন্যা এনে।
চির অমলিন তাঁহার স্মৃতি রহুক মোদের হৃদয়পুরে।।
তিরোভাব—৩ ভাদ্র। কৃষ্ণা চতুর্থী। ১৩৫৮ সন

এ স্মৃতিমঞ্চের বামে শ্রীল নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত স্মৃতিস্তম্ভ। লেখা আছে, বল্লরীঘেরা পদ্মের পাশে—চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের মধুর গৌরাঙ্গধামে প্রয়াণের তারিখ—

১৭ আষাঢ়। বিবস্বত সপ্তমী। ১৩৩৭ সন।

শুনেছি সরোজকুমার ও নরেন্দ্রনাথ পরস্পর গুরু-শিষ্য। মকরধ্বজ কর ছাড়া, মোহনঠাকুর নামে জনৈক গৌরজনের কথা জানা যায়। ইনি পানিহাটিতে বাস করতেন। নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র শ্রীঅভিরামঠাকুর ছিলেন পূর্বলীলায় শ্রীদাম সখা। এঁর শ্রীপাট, হুগলী জেলার খানাকুল। এই অভিরামেরই শিষ্য ছিলেন পানিহাটিবাসী মোহন ঠাকুর। বিখ্যাত "পাটপর্যটন" গ্রন্থে দেখা যায়—

"পানিহাটিতে ঠাকুর মোহনের স্থিতি।"

৯২৩ বঙ্গাব্দে ইনি পানিহাটিতে বিদ্যমান ছিলেন।

পানিহাটির গৌরগণের মধ্যে পুরন্দর পণ্ডিতের নাম করেছেন কেউ কেউ। পণ্ডিতজী নিত্যানন্দ শাখা। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পণ্ডিত পুরন্দর। প্রেমার্ণব মধ্যে যৈছে ফিরেন মকর।।

পুরীতেও বাস করতেন পুরন্দর। যখন মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নামপ্রেম বিতরণের জন্য নিতাইচাঁদ এলেন গৌড়দেশে, সেই সময় পুরন্দর এসেছিলেন প্রভুর সাথে। ইনি প্রায়ই আবিষ্ট অবস্থায় থাকতেন,

লিখেছেন ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাস, তাঁর শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

পুরন্দর পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।. মুঞিরে অঙ্গদ বলি লাফ দিয়া পড়ে।।

বৈষ্ণববন্দনায় পাই—

পুরন্দর পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদ-বিক্রম। সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ।।

এঁর ভবনে নিতাইচাঁদের খুব যাতায়াত ছিল। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবতে পুরন্দর পণ্ডিতের বিষয়ে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাতে মনে হয়—পুরন্দর পণ্ডিত খড়দহের অধিবাসী। আবার বৈষ্ণবাচারদর্পণে দেখা যায় এঁর বাসভূমি পাড়পুরে বা পাহাড়পুরে। মনে হয়, নিতাইচাঁদের সাথে প্রথম নামপ্রেম বিতরণে ইনি পানিহাটিতে ছিলেন এবং পানিহাটি-খড়দহ খুব কাছে অবস্থিত ও দুই স্থানেই পুরন্দরের সতত গতাগতি দেখে অনেকেই পুরন্দরকে পানিহাটিবাসী ভেবে সেইমতই বিবরণ দিয়েছেন। মূলে ইনি শ্রীপাট খড়দহেরই অধিবাসী। অনেকের মতে কাশী মিশ্র নামে জনৈক গৌরজন, পানিহাটিতেই বাস করতেন। ৯২৩ সালে ইনি পানিহাটিতে বিদ্যমান ছিলেন। এর অধিক আর কিছু জানা যায় না—এঁর বিষয়ে। অপর কাশীমিশ্র পানিহাটিবাসী নহেন। ইনি উড়িষ্যাবাসী শ্রীচৈতন্য শাখা। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের শ্রীগুরুদেব—রাধাকান্ত-সেবক। এঁর বাড়ীতেই গম্ভীরাপীঠ, বর্ত্তমান রাধাকান্ত মঠ। মহাপ্রভুর দীর্ঘ নীলাচলবাসের পূত-ধাম।

শ্রীপাট ও বিষ্ণু-বৈষ্ণব দেবালয় ছাড়াও পানিহাটিতে বেশ কয়েকটি শিবমন্দির এবং শক্তিপীঠ রয়েছে। দণ্ডমহোৎসবতলার কাছাকাছি জটিলেশ্বর শিবমন্দির-এর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

পানিহাটির প্রায় প্রান্তে, সুখচরের দিকে যাবার পথের পাশেই আছেন মনস্কামনেশ্বর শিব। ত্রাণনাথ স্কুলের পাশে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর গায়েই বিরাজমান একটি ছোট্ট শিবলিঙ্গ। ফলকে লেখা—

তেরশ ছত্রিশ সালে শান্তিনাথ শিব— লভিতে অক্ষয় নিত্য সুখশান্তি শিব।।
স্থাপিল অমৃতলাল, মুখ্য উপাধ্যায়। নির্মিত এ মঠ, বিষ-বিষয়াবজ্ঞায়।।

এ শিব ঠাকুর যেখানে আছেন, তার গায়েই রাস্তা। রাস্তার পাশেই, ত্রাণনাথ স্কুলের সেই ঘরটি—যে ঘরে কীর্ত্তন সমাধানের আগে ও পরে, প্রয়োজনে বিশ্রাম করতেন শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়, সগণে। কত সাধু-সুজনের সহবাসে ধন্য এ স্থান!

গঙ্গাতীরে দাঁ'দের ঠাকুরবাড়ীর অঙ্গনেও দুটি শিবমন্দির রয়েছে। কৃষ্ণমণিময় লিঙ্গ। শিবঠাকুরদের নাম, তারকেশ্বর ও গঙ্গাধর। মকরধ্বজ করের ভিটার কাছেই একেবারে গঙ্গাকূলে তিনটি শিবমন্দির, রাজা চন্দ্রকেতুর কালিবাড়ীর সংলগ্ন, গঙ্গার দিকে মুখ করে। মাঝের মন্দিরটি বড়। শিবলিঙ্গটিও কৃষ্ণমণিময়, বড়সড়। দুপাশের মন্দির দুটিতে গৌরীপট্টের ওপরে দুটি লিঙ্গ স্থাপন করা হয়েছে, এ দুটি, মাঝেরটির মত এক পাথর হ'তে কুঁদে বের করা নয়।

পানিহাটির দেবীমন্দিরগুলির মধ্যে রাজা চন্দ্রকেতুর কালিবাড়ি প্রসিদ্ধ। পঞ্চচূড় বৃহৎ মন্দিরটির গঠন-আঙ্গিক নিজস্ব বৈশিষ্টের দাবী রাখে। এই পঞ্চরত্ন মন্দিরের কেন্দ্রে স্থাপিত চতুর্ভূজা কালীমূর্ত্তি

খুব বড় নয়। ছোটই বলা চলে। সিংহাসনে বিরাজিতা মুক্তকেশী লোলরসনা মাতৃমূর্ত্তি মহৎপ্রাচীন। ত্রাণনাথ স্কুলের কাছেই সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি। অনেকে বলেন ত্বমীশ্বরী। বেশ বড়সড় মাতৃমূর্ত্তি। ঘোরা গলদ্রুধিরচর্চিতা—চার হাতে খড়্গ, মুণ্ড, অভয় আর বর। পদতলে ভোলাবাবা। মায়ের আসনে ছোট সিংহাসনে বিষ্ণুচক্রও বিরাজিত। মন্দিরের গায়ে মর্মর ফলকে লেখা, কারও হৃদয়ের আর্তির প্রতিরূপ—

একচল্লিশ সনে সাতই ফাল্গুনে যেই ফণিলালে নিয়ে রাখলে তব পায়।
তাহারি পত্নী দীনা মৃণালিনী শুধু তারি পদ সেবিতে সদা চায়।।

এ দুটি কালীমন্দির ছাড়াও আছে বন্দুক-ব্যবসায়ী দাঁ'দের তৈরী জগদ্ধাত্রী মন্দির। নন্দলাল দাঁ, ১৩২৯ সনের ১৮মাঘ বৃহস্পতিবার এই মন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রশস্ত গঙ্গাঘাট ও সেবকখণ্ড সহ মন্দিরচত্বরের নাটশালটি সুপরিসর। পাশে দোতলা বাড়ীটি সম্ভবতঃ সেবাইতরা তৈরী করেছিলেন, সময়ে অসময়ে এসে , সাময়িক থাকবার জন্য। এখন ওটি ভাড়া দেওয়া হয়েছে—"কুমারেশ" ঔষধ সংস্থাকে। ওটি এখন কুমারেশ-কারখানা। বিগ্রহ চুরি হ'য়েছিল—কিছুদিন আগে। বিগ্রহ ছিলেন ধাতুময়ী। এখন দারুময়ী মূর্ত্তি বসেছেন। বেতনভোগী উড়িয্যাবাসী ব্রাহ্মণরা সেবা করেন। মন্দিরের প্রবেশপথের বিপরীত দিকে আগে বিস্তৃত কবরস্থান ছিল, বললেন একটি স্থানীয় যুবক। এখন সেখানে গড়ে উঠেছে বিদ্যালয়।

পানিহাটির গোবিন্দহোমের গায়েই শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ অঙ্গন। এ ঠাকুরবাড়ী নির্মাণ ক'রে, ঠাকুরসেবা নিজ গুরুদেবকে সমর্পণ করেছিলেন জনৈক সজ্জন। ঠাকুর-সেবাইত তথা যাবতীয় সত্ত্বাধিকারী ছিলেন রাঘবপণ্ডিতবংশীয় ব্রজেন্দ্রমোহন গোস্বামী। এই সুশীল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবশাস্ত্র-সাহিত্যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। সুধীকুল তাঁকে ভাগবতরত্ন উপাধিতে ভূষিত করে, তাঁর প্রতি যথোচিত ব্যবহারই করেছেন। বাড়ীর একাংশে ভাড়াটিয়া আছেন, কিছু। তা হ'তে যা আয় হ'ত, তাতেই সেবার সংস্থান করতেন অযাচক ব্রজেন্দ্রমোহন। আবাস-লগ্ন মন্দির আর নাটমন্দির। গঙ্গাভিমুখী দ্বিতল মন্দিরের মাঝে সিংহাসনে বিরাজিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। মণিময় বেণুধর ত্রিভঙ্গ কৃষ্ণের নাম রাধাবল্লভ। বামে ধাতুময়ী শ্রীমতীজী রাধারাণী। সুদর্শন, পরিপাটি সেবা। রাধাবল্লভের সিংহাসনে মধ্যমণি হ'য়ে বিরাজ করছেন একটি বিষ্ণুচক্র বা শালগ্রাম শিলা এটি রাঘবের সেবিত (বলেছেন স্বয়ং রাঘববংশীয় ব্রজেন্দ্রমোহন)। আমার বহু সময় কেটেছে এই ব্রজেন্দ্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গে। অপুত্রক বৃদ্ধ বড়ই ভালবাসতেন আমায়। তাঁর স্নেহের টানে প্রায়ই খড়দহ হ'তে গেছি তাঁর দেবাঙ্গনে। সদাচার ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। আতপের অন্ন ছাড়া উষ্ণ অন্ন কদাচও তাঁর ঘরে হয় নাই। সব গঙ্গাজলে রান্না। উপকরণের বাহুল্য ছিল না নিত্যসেবায় (বারমাস তিরিশ দিনই, উৎসবাদি ব্যতীত, ঠাকুরের ভোগ লাগত—মুগডাল, বেগুনভাজা আর আলুর তরকারি)—কিন্তু ছিল অন্তরের প্রীতিসম্বন্ধ। নাড়ির টান। প্রতিবৎসর অপতিতভাবে তিনি যেতেন শ্রীক্ষেত্রে—রথযাত্রায়। রথের দুই দিন আগে, রাধাকান্তমঠের গৌরগম্ভীরায় (মহাপ্রভুর বাসস্থলী) যে

ঝালিসমর্পণ হত তাতে রাঘববংশীয় এই গোস্বামী-সন্তানের ছিল মুখ্য ভূমিকা। আমি তাঁর সাথে পুরী গিয়ে ঝালি সমর্পণ কালে তাঁর ভাবমূর্ত্ত স্বরূপ দেখে মুগ্ধ হ'য়েছি। শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় তাঁকে প্রতিবৎসরেই অপতিতভাবে সাথে করে নিয়ে গেছেন, পুরীতে। মুখ্যতঃ ঝালিসমর্পণেরই জন্য। তিনি আজ বেশ কয়েক বৎসর বাঞ্ছিতধামে গমন করেছেন। তাঁর রাধাবল্লভের সেবা, বর্ত্তমানে আশাতীতভাবে অবনত। অহো দুঃখ!

শ্রীপাট পানিহাটির আর একটি পুণ্যপীঠ—**নিত্যানন্দ হরিসভা**। এখানে অনেক সুচিহ্নিত সজ্জনের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। ছোট এই চত্বরটির এককোণে একটি প্রাচীন বটগাছ জায়গাটিকে শান্ত-সুশীতল করে রেখেছে। হরিসভার চত্বরে ঢুকে, হাতে বামে প্রথমেই সিদ্ধ মহাত্মা চাঁদ দালালের স্মৃতি পীঠ। ইনি শ্রীপাট পানিহাটিতে বসেই শ্রীবৃন্দবনের ঘটনা বলে দিতেন। বঙ্গাব্দ ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভেই এঁর সাধনোচিত ধামপ্রাপ্তি। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় পুষ্প সমাজে—পানিহাটির "গৌরাঙ্গধাম" প্রতিষ্টাতা পরমভাগবত গুরুচরণ সেন মহোদয়ের পুত্র গৌর-রসামোদী বেণীমাধব সেনের স্মৃতিফলক বিরাজিত। তৃতীয় স্মৃতি-পীঠে লিখিত আছে—

শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ
পুরীধামের বড় বাবাজী
শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস দেবের
অভিন্নহৃদয়
সিদ্ধ
শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র দাস বাবাজীর পুষ্পসমাজ।
তিরোভাব-২১ আষাঢ়। অমাবস্যা। ১৩০৯ বঙ্গাব্দ।
সেবক-ষষ্ঠীদাস

পরবর্ত্তী স্মারকে লিখিত আছে—

ওঁ
অবধূত
জ্ঞানানন্দ মহারাজ
স্মৃতি
জন্ম—পানিহাটি। ঘোষপাড়া।
১২৩১ বঙ্গাব্দ। ১৩ চৈত্র। রবিবার।
তিরোভাব—মহানির্ব্বাণ মঠে। কলিকাতায়।
১৩১৭ বঙ্গাব্দ। ৭ মাঘ। শনিবার।

অবধূত জ্ঞানানন্দজী, ঠাকুর নিত্যগোপাল নামে আখ্যাত। ইনি রত্নগর্ভা পানিহাটির সুসন্তান।

বৈরাগ্যপথের আদর্শ পথিক। ভক্তিময় কল্যাণবিগ্রহ এই মহাপুরুষ নামসংকীর্ত্তনে বিশেষ পারঙ্গত ছিলেন। এঁর সাথে ছিল, পুরীর বড়বাবাজী মহাশয়ের(শ্রীরাধারমণদেব) অভিন্নাত্মা প্রণয়-সম্বন্ধ। এঁর স্মৃতি ফলকের নিচেই—

ভক্তবান্ধব যামিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের মর্মর-স্মারক। ইনি শ্রীপাট খড়দহবাসী।

পরবর্ত্তী স্মৃতিফলকটিতে লেখা আছে—

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

পানিহাটি

দণ্ডমহোৎসবে আগমন

আনন্দ-স্মৃতি

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮ জুন।

সেবক—তিনকড়ি মোদক

উপরের ফলকটির নিচের স্মারক— **শ্রীগুরু**

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গজন

শ্রীকৃষ্ণানন্দ পরমহংস (শ্রীগোপাল শর্মা)

১২৭৬ বঙ্গাব্দ। ১৯ জ্যৈষ্ঠ।

পূর্বকথিত বটগাছটির নিচে, একটি অস্থি-সমাধি বিরাজিত। মলিন হয়ে যাওয়ায় এবং বারবার কলিচূনের প্রলেপে ফলকটির ভাষাগুলি সব পড়া গেল না। তবে **সমাজটি**—জনৈক **"ঠাকুর হরনাথ"** নামে **মহাত্মার**। এই পর্যন্ত বোঝা গেল—মোটামুটি।

পাশেই চিহ্নিত গৌরজন,

পানিহাটিবাসী, মধুর গৌরাঙ্গধামগত

নরেন্দ্রনাথ চট্টোপধ্যায়ের সমাজ।

এখানে চট্টোপাধ্যায়ের তিরোভাব কাল লেখা আছে—

আষাঢ়। শুক্লা ৭মী। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

(কিন্তু বড় হরিসভায় লেখা আছে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)

পরবর্ত্তী স্মৃতিফলকে লেখা আছে—

শ্রীগৌরহরি

পানিহাটীর আদি গৌরভক্ত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

তিরোভাব-২৭আষাঢ়। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

পরবর্ত্তী মর্মরস্মারকে উল্লিখিত—

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম কলপতরু

অদভূত যাঁহাক প্রকাশ।।

পরমারাধ্য

শিশু পশু পালক বালক জীবন

পরমদয়াল

শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস দেব

স্মৃতিমন্দির

আবির্ভাব—১২৬০ বঙ্গাব্দ। ২৯ চৈত্র

তিরোভাব—১৩১২ বঙ্গাব্দ। ১৩ ফাল্গুন।

এই মর্মর স্মারকের পরিচিতিময় প্রশস্ত ফলকটির নিচেই—বড় বাবাজী মহাশয়ের একটি ছোট মূর্ত্তি বিরাজিত। বিগ্রহটি সুদর্শন, তবে অবহেলিত। এ বিগ্রহটির সামনেই দুটি ছোট ছোট মর্মরময় চরণচিহ্ন।

শ্রীগুরুদেবের পাশেই শিষ্যের পুষ্পসমাজ। বড় বাবাজী মহাশয়ের স্মৃতিফলকের পাশেই তাঁর প্রিয়জন গোবিন্দ দাস বাবাজী জ্যেঠা মহাশয়ের আসন।

শ্রীশ্রীরাধারমণ-প্রিয়সেবক

শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী মহাশয়

"পুষ্প সমাজ"

নবদ্বীপে, বৈশাখী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে তিরোভাব।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

গোবিন্দদাসজীর পাশেই বড় বাবাজী মহাশয়ের অপর শিষ্য-সন্তান ফণীকাকার স্মারক—

শ্রীগুরু

শ্রীশ্রীরাধারমণৈকপ্রাণ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজী মহাশয়

(ফণীভূষণ)

স্মৃতি

তিরোভাব—১৩২২ বঙ্গাব্দ। ৪ শ্রাবণ

পরববর্ত্তী ফলক—

ভজ- নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ- হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

ভক্ত শ্রীধর দাস বাবাজীর সমাজ

১৩২১ বঙ্গাব্দ। ২৭ কার্তিক। কৃঃ ১১শী।

পাশেই হাবলাদার বাবা ও মায়ের স্মৃতি ফলকে তাঁদের নাম লিখিত—

জীবনধন মুখোপাধ্যায়

নিস্তারিণী দেবী

প্রণতঃ—হরেন্দ্রনাথ

(প্রসঙ্গতঃ—হাবলা দাদা, শ্রীপাট পানিহাটীর অবিস্মরণীয় নাম। এই নিত্যানন্দ হরিসভার পাশেই তাঁর বাড়ী। বাল্যাবধি ভক্তজীবন। শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের সুচিহ্নিত দাস। রাঘবভবন ও দণ্ডমহোৎসবতলার উন্নতিও প্রচারের মূলে এঁর অবদান যথেষ্ট। গৃহস্থজীবনের সমান্তরালে তাঁর ভজন জীবন—সবারই আদর্শ। ইদানীং তিনি দেহরক্ষা করেছেন। হাবলাদাদার পোষাকী নামই হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

পাশে মুকুন্দদাস বাবাজীর স্মারক। এঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল মাণিকলাল মোদক। ইনি, শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশ্রয়ের মন্ত্রশিষ্য। ইনি কিছুদিন মহোৎসবতলার মন্দিরের সেবা করেছেন।

মুকুন্দদাসের পাশে পানিহাটির সিদ্ধা ভক্তমাতা নিরোদিনীর স্মৃতিফলক। এখানে হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের নাম লেখা আছে। পাশাপাশি আছে পানিহাটীর গৌরবনিধি—

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়

বংকুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিদাস বৈরাগী, গোপালদাস বৈরাগী ও মুকুন্দদাসের (মানিকলাল মোদক) নাম।

আরও আছে বহুজনের স্মৃতিফলক। চারধারে ভক্তজনের মেলার মাঝে একটি প্রশস্ত তুলসী মঞ্চ। মঞ্চটির চারদিকে চার যুগের তারকব্রহ্ম নাম লিখিত আছেন—

সত্যযুগের তারকব্রহ্ম নাম

১/ নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণ পরামুক্তি নারায়ণ পরাগতিঃ।।

ত্রেতা যুগের তারকব্রহ্ম নাম

২/ রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন!
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ্য বামন!!

দ্বাপর যুগের তারকব্রহ্ম নাম

৩/ হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাম্ জগদীশ রক্ষ।।

কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

মঞ্চে বৃন্দাদেবী বিরাজিতা। প্রণাম করে একটু এগিয়ে পাকা বড় রাস্তার দিকে (B. T. ROAD) যেতে হাতের বামে পড়ছে—ঠাকুর নিত্যগোপাল রোড। পথের মুখেই একটি বাড়ী। একতলা। বাইরে ফলকে লেখা—তারা আলয়। এ ভবনে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর একটি ভাবাবিষ্ট চিত্রপট আছেন। মাঝারি আকারের। গৃহস্বামী ছিলেন—পাঠবাড়ীর (বরাহনগর) ঠাকুরসেবক শ্রীমুরলীধরদাদার সমাশ্রিত শিষ্য। তাঁর সুবাদে, এবাড়ীতে সংরক্ষিত প্রাচীন মহাজনী স্মৃতিসম্পূট, বহুবার দর্শন করেছি। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীহস্তলিপি ছাড়াও এ বাড়ীতে দর্শন করেছি গৌর-গৌরগণের কিছু কিছু স্মারক অবশেষ—যা সম্ভবতঃ কোনও সময়ে অমূল্যধন রায় ভট্টের সংগ্রহ হ'তেই, যে কোনও পথে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীদণ্ডমহোৎসব

দণ্ডমহোৎসব—নিতাইকৃপামূলা গৌরকরুণা-মহোৎসব। কাওকে দণ্ড দেওয়া হয়, তার ভুল বুঝিয়ে, তাকে সঠিক পথে এনে শুদ্ধ করবার জন্য। তার দোষ ঘুচিয়ে তাকে যোগ্য করবার জন্য। তাকে উপলক্ষ্য করে একটি আদর্শকে স্থায়ী করবার জন্য। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে, জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশীতে দণ্ডমহোৎসব। ৯২৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে, করুণামূর্ত্তি নিতাইচাঁদ, রঘুনাথদাসকে সূত্র করে তেমনি আদর্শই রাখলেন আমাদের সামনে, যার অন্তরঙ্গ বিচার, আশ্রয় যদি ঠিক ঠিক হয় তবেই বিষয়ও পাওয়া যাবে, ঠিক ঠিক। নিতাইচাঁদই গৌরদাতা। গোড়ায় লক্ষ্য ঠিক রেখে এগোলে, নিশ্চিত প্রাপ্তি হবেই। আর বহিরঙ্গে মালসাভোগ প্রবর্ত্তন। চিড়াদধি মহোৎসবে সকলকে এক করবার প্রয়াস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার। চিড়াদধি-মহোৎসব খ্যাতি হইল যার।।

চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী এই বিষয়ে প্রচুরতর আলোকপাত করেছেন। বিস্তৃত বিবরণে তিনি পূর্ব-পর সকল বৃত্তান্তই জানিয়েছেন।

চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা যায়, মহাপ্রভুর প্রাণ বড়ই কেঁদে উঠছে সবার তরে। তখন নিতাইচাঁদ পুরীতেই আছেন, মহাপ্রভুর কাছে। এমন সময়ে—

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি। নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি।।
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি! সত্বরে চলহ তুমি গৌড়দেশ প্রতি।।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে। মুর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে।।
তুমিও রহিলা যদি মুনিধর্ম ধরি। আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি।।
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সবার। বোল দেখি কে বা আর করিবে উদ্ধার!!

ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে। তবে অবতার কি নিমিত্ত করিলে?
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও। তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও।।
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন। ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন।।
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র সেইক্ষণে। চলিলেন গৌড়দেশে লঞা নিজগণে।।
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়। সর্ব পারিষদ করিলেন প্রেমময়।।
যত দেহধর্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ। কাহারো নাহিক, পাই পরানন্দসুখ।।
পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ। কে বর্ণিবে, কে বা জানে, সকলি অনন্ত।।
হেনমতে নিত্যনন্দ—শ্রীঅনন্তধাম। আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহাটী গ্রাম।।
রাঘবপণ্ডিতগৃহে সর্বাদ্যে আসিয়া। রহিলেন সকল পার্ষদগণ লইয়া।।
পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ। সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ।।
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দরায়। প্রেমদৃষ্টি বৃষ্টি করি সর্বদিগে চায়।।
এইমত পানিহাটী গ্রামে তিন মাস। করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাস।।
এইমত পরানন্দ-প্রেমসুখরসে। ক্ষণ হেন কেহ না জানিল তিন মাসে।।

ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, পানিহাটির দণ্ডমহোৎসব নিতাইচাঁদের সাম্যবাদী মানবমুখিতার এক সুদৃঢ় পদক্ষেপ। মধ্য যুগের সেই নিকষ আঁধারে ঘেরা অবজ্ঞাত/অন্ত্যজ মানুষদের এক করতে, মনুষ্যত্বের মর্যাদায় সংহত করতে নিতাইচাঁদের এই উদ্যম একান্তই যুগোপযোগী শুধু নয়, অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল, ইতিহাসের দাবিতে। স্বার্থপর সমাজপতিগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে জাতপাতের বাঁধনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে, ছত্রিশ জাতকে দই-চিড়ের ফলারে এক করতে, নিত্যানন্দের এই আপ্যায়ন-বোধ শুধু অভিনব নয়, এক জাতীয় সংহতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে নিরলস দৃঢ়চিত্ততার নামান্তর। সকলকে একই সাথে কোনও বাছাবাছি না করে এক সারিতে বসিয়ে খাওয়ানো, সে সময় বড় কেউ কল্পনায় আনতেও পারতেন না। যা নিতাইচাঁদ শুধু করলেনই না, দেখিয়েও দিলেন। স্বার্থপর মোড়লদের বুঝিয়েও দিলেন, তাদের চোখরাঙ্গানো শূণ্যগর্ভ চোটপাটকে ভয় নেই তাঁর। ক্রমেই, যুগের হাওয়া পালটাচ্ছে। সবাই যেন মানুষকে, মানুষ বলে মনে করেন। কাজগুছানোর যন্ত্র বলে নয়। সকলকে এক করার এই চেষ্টা সেকালের চালচিত্রে অভূতপূর্ব—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আরও ভাববার বিষয়—সমাজে যারা সম্পন্ন, তাদের সম্পদ সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়াই যদি অর্থনৈতিক সাম্যের মূল কথা হয়, তবে রঘুনাথদাসকে নিমিত্ত করে, নিত্যানন্দের ইচ্ছায় বা আদেশে অনুষ্ঠিত এই "দণ্ডমহোৎসব", রঘুনাথের মাধ্যমে দেশের দশজনের কাজে লেগে, অর্থনৈতিক সাম্যের মূল আদর্শকেই রূপায়িত করেছে। সংগঠিত করেছে। রঘুনাথদাসের বাবা গোবর্দ্ধনদাস মজুমদার ও জ্যেঠামশাই হিরণ্যদাসের, শানুক্রমে সঞ্চিত অর্থ ভাণ্ডারের অংশবিশেষ সেদিন এভাবেই ব্যয়িত হয়েছিল। পরিণামে এনেছিল র্থপরতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে, মহোৎসব শুরু হয়েছিল এই দণ্ডমহোৎসবকেই সামনে রেখে। আজও সে অপ্রতিহত স্রোত বয়ে চলেছে সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরেই। **শুধু পুঁজির বিস্তারই নয়, সমাজে একটা সাবলীলতা, সবার সাথে সবার আত্মিক যোগাযোগ ঘটেছিল এই অনুষ্ঠানের মাঝে। হয়েছিল জাতিভেদের বিলুপ্তি। বলতে গেলে এই ভ্রাতৃত্ববোধ, সকলকে কাছে টেনে নেবার এই পথ তো নিতাইচাঁদই দেখালেন। গুণের আদরই সত্যিকারের আদর। বংশের দোহাই দিয়ে একচেটিয়া সুবিধা লোটার চেষ্টা যে সঠিক পথ নয়, এতো দেখালেন প্রভু নিত্যানন্দই। অদ্বৈত প্রভু, তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্র নামাচার্য হরিদাসকে (যিনি ছিলেন জন্মসূত্রে মুসলমান) দিয়ে যে সমূহ বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, তাকে পত্র-পল্লবে, ফুলে-ফলে পূর্ণতমরূপ দিলেন অভিযাত্রী নিত্যানন্দই। এ খবর আমরা ক'জন রাখি বা অনুভব করি!!**

নিতাইচাঁদের পানিহাটিতে শুভ আগমন বার্তা বায়ুবেগে ছড়িয়ে গেল। গৌর-আজ্ঞায় নামপ্রেম বিলাতে, নিতাইচাঁদের শুভ উপস্থিতির কথা শুনতে পেলেন সপ্তগ্রামের রাজপুত্র রঘুনাথ দাস। জানা যায়—পূর্বে তিনি দুইবার শান্তিপুর গিয়েছিলেন মহাপ্রভুর কৃপাকণা আহরণে। কিন্তু তাকে দুবারই ফিরিয়ে দিয়েছেন মহাপ্রভু। মামুলি উপদেশ কিছু দিয়েছেন দ্বিতীয় বারে। এই পর্যন্ত।

হুগলী জেলার মহাসমৃদ্ধিমান্ নগর সপ্তগ্রাম। এ স্থানের জমিদারপুত্রই রঘুনাথ দাস। তাঁর বাবা গোবর্দ্ধনদাস ও জ্যেঠা হিরণ্যদাসের একমাত্র উত্তরাধিকারী। সপ্তগ্রামের দক্ষিণ অংশে কৃষ্ণপুর। এখানে সরস্বতী নদী বহমানা। এই নির্মলা স্রোতস্বিনীর পূর্বতটে হিরণ্য আর গোবর্দ্ধনের বসতবাড়ী। গোটা সপ্তগ্রামই এঁদের আধিপত্যে। তখন সপ্তগ্রাম অঞ্চল বলতে সাতটি গ্রামকে (সপ্তগ্রাম। বংশবাটি। শিবপুর। বাসুদেবপুর। কৃষ্ণপুর। নিত্যানন্দপুর। শংখনগর) বোঝালেও তৎকালীন সপ্তগ্রামের ভূসীমা ছিল, যশোহরের ভৈরব নদ থেকে এদিকে রূপনারায়ণ নদ অবধি সুবিস্তৃত। সপ্তগ্রাম-রাজবাড়ীর গুরু তথা কুলপুরোহিত যদুনন্দনের দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। যদুনন্দনের বাড়ি ছিল চাঁদপুরে। নামাচার্য শ্রীহরিদাসঠাকুর একবার চাঁদপুরে এসেছিলেন। এই সময় বালক রঘুনাথ, বাবার সাথে চাঁদপুরে আসেন ও হরিদাস ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। অজান্তেই মুখ্যতঃ নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরের দর্শনে, বাল্যেই রঘুনাথের হৃদয়ে স্বাভাবিক গৌর-অনুরাগের উদ্‌গম হয়। যদুনন্দন প্রায়ই আসতেন রঘুনাথের ঘরে, সপ্তগ্রামে, পূজাপাঠ বা দৈবক্রিয়াকর্মে। তাঁর দর্শন ও সঙ্গপ্রসঙ্গে রঘুনাথের অন্তরে অনুরাগবীজ ক্রমে অংকুরিত হতে থাকে। মহাপ্রভুর কথা শুনে তিনি ভেতর ভেতর তাঁতেই আত্মসমর্পণ করেন। অনুমিত হয় সার্থকভাবেই—এরপরই তিনি যদুনন্দনকে শ্রীগুরুপদে বরণ করেন। বিশেষ গৌরজন, বাসুদেব দত্তের সাথে যদুনন্দনের খুবই আন্তরিকতা ছিল, সেই সুবাদে সম্ভবতঃ সার্থকভাবে বাসুদেব দত্তের সঙ্গপ্রসঙ্গে, রঘুনাথের হৃদয়ে অংকুরিত গৌর-অনুরাগ, শ্রবণকীর্ত্তনময় প্রেম-জলে সিঞ্চিত হ'য়ে ক্রমে ক্রমে মহীরুহের আকার ধরতে থাকে। ভেতরে ভেতরে।

এমন সময় রঘুনাথ শান্তিপুরে গৌরআগমন বার্ত্তা শুনে ছুটে যান। পর পর দুই দুই বার। কিন্তু স

অন্তরে ফিরে আসেন। যা পাবার আশায় ছুটেছিলেন, তা না পেয়ে, বেশ আশাহত হয়েই এলেন। মামুলি উপদেশ কিছু দিলেন মহাপ্রভু দ্বিতীয় দর্শনে, কিন্তু প্রাণের পরশ কৈ! কিছু কাল পরে রঘুনাথ, লোকমুখে শুনতে পেলেন পানিহাটিতে নিতাইচাঁদের প্রেম বিতরণলীলার অলোক-সংবাদ। পূর্বে বাড়ীর সবার চোখে ধূলো দিয়ে ক'বার ঘরও ছেড়েছিলেন কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই ধরা পড়ে একরকম গৃহবন্দী হয়ে আছেন। এখন—

তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে। নিত্যানন্দ গোসাঞি পাশ চলিলা আর দিনে।।
পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন। কীর্ত্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহুজন।।
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে। বসিয়াছেন যেন কোটি সূর্যোদয় করে।।
তলে উপরে বহুভক্ত হইয়াছে বেষ্টিত। দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত।।
দণ্ডবৎ হইয়া সেই পড়িলা কথো দূরে। সেবক কহে—রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে।।
শুনি প্রভু কহে—চোরা দিলি দরশন। আয় আয় আজি তোরে করিমু দণ্ডন।।
প্রভু বোলায় তিঁহ নিকটে না করে গমন। আকর্ষিয়া তার মাথে প্রভু ধরিলা চরণ।।
কৌতুকী শ্রীনিত্যানন্দ সহজে দয়াময়। রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়।।
নিকটে না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে। আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিমু তোমারে।।
দধি চিড়া ভাল মতে খাওয়াও সব জনে। শুনিয়া আনন্দ হইল রঘুনাথের মনে।।

এ প্রসঙ্গে অনুভবসিদ্ধা সখীঠাকুরাণীর (শ্রীরাধারমণ বাগ। নবদ্বীপ) উক্তি স্মরণীয়। "পানিহাটির গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি বটবৃক্ষতলে নিতাইচাঁদ, রঘুনাথ দাসের মাথায় শ্রীচরণ দিয়ে কৃপাশক্তি সঞ্চার করলেন। নিতাইচাঁদের আজ্ঞায়—রঘুনাথ দাস, মহাপ্রভুর প্রেমধন চুরি করার চেষ্টা করেছেন এই অভিযোগে, রঘুনাথের প্রতি সর্বসাধারণকে, দধিচিড়ামহোৎসবে প্রসাদ পাওয়াবার ব্যয়রূপ দণ্ডের আদেশ হল। আহা! যেমন চোর, তেমনি বিচারক। যেমন অপহৃত ধন, তেমনই দণ্ড!!"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (অন্ত্য। ৬ষ্ঠ) এ সংবাদে মনে প্রশ্নের উদয় হয়। নিতাইচাঁদের সাথে রঘুনাথদাসের এইতো প্রথম দেখা! তিনি এর মধ্যেই কি চুরি করলেন নিতাইচাঁদের!! আর, চুরি করার মত মানসিকতা বা আর্থিক অসঙ্গতিও তো নেই তাঁর!!!

শাস্ত্রে সহৃদয়ের অনুভবকে প্রমাণ বলে ধরা হ'য়েছে। সহৃদয় শিরোমণি শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের দণ্ডমহোৎসব-কীর্ত্তনে এ প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে। বাবাজী মহাশয় বলেছেন—নিতাইচাঁদ কেন রঘুনাথকে "চোরা" সম্বোধন করলেন! এর আগে দেখাই তো হয় নাই। কেমন করে চুরি করল!! মোটকথা ভিতরের খবর হচ্ছে এই, **নিতাইচাঁদের মনে একান্ত অভিমান—গৌর তাঁর নিজস্ব ধন**। নিতাইচরণে কিছু না জানিয়ে রঘুনাথ গিয়েছিলেন শান্তিপুরে। গৌরধনে ধনী হতে। যে পরের দ্রব্য নেয় না বলে, তাই তো চোর বলে। তাই, **নিতাইচাঁদ, রঘুনাথকে চোর বলেছেন—যেহেতু রঘুনাথ নিতাইচাঁদের আনুগত্যেই গৌরধন ভোগ করতে গিয়েছিলেন। আর সেইজন্যই মহাপ্রভুও তাকে দুবারই**

ফিরিয়ে দিলেন। ঘটনার তাৎপর্য—মহাপ্রভু জগৎকে জানালেন, যত বড়ই অধিকারী হোক না কেন, নিতাই-আনুগত্য বিনা, কেউই পাবে না আমায়! বাবাজী মহাশয়ের ভাষায়, মহাপ্রভুর আশয় এই—আমাকে পেতে যার আছে সাধ, সে বুকে ধরুক নিতাইচাঁদ।।

আনুগত্যের কত বল, তা এইবার জানা গেল। শুনেছি শাস্ত্রে আছে—মহতের আনুগত্য গ্রহণ না করে কংস, কৃষ্ণকে দেখেও দেখতে পান নাই। যে কৃষ্ণের নামেই জীবের দুঃখ দূরে যায়, সেই কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ কাছে পেয়েও প্রাণ সুশীতল হয় নাই কংসের। বরং কৃষ্ণকে, শমনের মত বোধ হয়েছে। কৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ভোগ হয়নি। দেখেছেন মাত্র, স্বরূপের অনুভূতি হয় নাই। এইবার গৌরহরিও আমাদের সে বিষয়ে একান্ত সাবধান করে দিলেন, তাঁর প্রাণপ্রিয় নিত্যদাস রঘুনাথকে উপলক্ষ্য করে।

ফিরে আসি পূর্ব প্রসঙ্গে। নিতাইচাঁদের চরণপরশ পেয়ে, তাঁর দিব্য আদেশে রঘুনাথের প্রাণে যেন নতুন চেতনা এল। তিনি বুঝলেন—কোন্ কালে, কোন্ গুণে, নিতাইকরুণা বিনে, কে পেয়েছে গৌরধনে! নিতাইচাঁদের আদেশ মাথায় ধরে রঘুনাথের আনন্দ আর ধরে না। তিনি লেগে পড়লেন ব্যবস্থায়। লোক পাঠিয়ে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার কাজে—

সেই ক্ষণে নিজলোক পাঠাইল গ্রামে। ভক্ষ্য দ্রব্য লোক সব গ্রাম হইতে আনে।।
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা। সব আনি প্রভু আগে চৌদিকে ধরিলা।।
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন। আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন।।
আর আর গ্রাম হইতে সামগ্রী মাগাইল। শত দুই চারি হোলনা তাঁহা আনাইল।।
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে। এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে।।
এক ঠাঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া। অর্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া।।
আর অর্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল। চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল।।

❋❋❋❋❋

সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল। ধ্যানে তবে নিতাই, মহাপ্রভুরে আনিল।।
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিল। তারে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিল।।
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া এক এক গ্রাস। মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস।।
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লইয়া। তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া।।
এইমত নিতাই বেড়ায় সকল মণ্ডলে। দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে।।
কি করিয়া বেড়ায় ইঁহো, কেহ নাহি জানে। মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোনও ভাগ্যবানে।।
তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা। চারি কুণ্ডী চিড়া তাঁর ডাহিনে রাখিলা।।
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাঁহা বসাইলা। মহাপ্রভু তবে চিড়া খাইতে লাগিলা।।
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হইলা। কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা।।

আজ্ঞা দিলা হরি বলি করহ ভোজন। হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভূবন।।
হরি হরি বলি সবে করয়ে ভোজন। পুলিন ভোজন সবার হইল স্মরণ।।
নিত্যানন্দ প্রভু মহাকৃপালু উদার। রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার।।
নিত্যানন্দপ্রভাব কৃপা জানিবে কোন্ জন! মহাপ্রভুরে আনি করায় পুলিনভোজন।।
মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হইতে। চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে।।
যত দ্রব্য লঞা আসে, সব মূল্যে লয়। তারি দ্রব্য মূল্যে লঞা তাহারে খাওয়ায়।।
কৌতূক দেখিতে আইল যত যত জন। সেহ চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ।।
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল। চারি কুণ্ডী অবশেষ রঘুনাথে দিল।।
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা। আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া।।
এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার। চিড়া-দধি মহোৎসব খ্যাতি হইল যার।।

রঘুনাথদাসের প্রতি কৃপাদণ্ড প্রকাশের দিনই (জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশী), চিড়া দধি মহোৎসব বা শ্রীমালসা ভোগের শুভ আবির্ভাব তিথি। এদিন হতেই মালসা ভোগের প্রকাশ বা প্রচার। কুণ্ডী বা হোলনা অর্থে ছোট বা বড় মাটির পাত্র। চলতি কথায় মালসা বা নাদা। এই মালসায় করে চিড়া ভোগ সমর্পিত হয়েছিল বলেই—সমাজে তার প্রচার মালসাভোগ বলে। মালসাভোগ আখ্যার এইমাত্র কারণ।

সেদিন অনন্ত মানুষের সমাগম হয়েছিল। নিতাইচাঁদের আদেশে আর রঘুনাথের আনুকুল্যে এই চিড়া দধি মহোৎসব এত বড় আকার ধারণ করেছিল, যে উত্তরকালে, রঘুনাথের মুখে সত্য বিবরণ শুনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন—

কোনও কোনও জন উপরে স্থান না পাইয়া। দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া।।
তীরে স্থান না পাইয়া আর কত জন। জলে নামি চিড়াদধি করয়ে ভক্ষণ।।
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে। বিশজন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে।।

রঘুনাথের ব্যাকুলতায় সকলি সুসমাহিত হ'ল, সেদিন। পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান সেরে করুণাবতার প্রভুদেব নিতাইচাঁদ বসলেন বটতলায়। দণ্ডমহোৎসবক্ষেত্রে, তরুরাজতলেই নিতাইচাঁদকে বসতে দেখে—

রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন। রাঘব পণ্ডিত দ্বারে কৈল নিবেদন।।
অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম। মোর ইচ্ছা হয়ে—পাই, চৈতন্যচরণ।।
বামন হইয়া যেন চাঁদ ধরিবারে চায়। অনেক যত্ন কৈনু যাইতে কভু সিদ্ধ নয়।।
যতবার পালাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া। পিতামাতা আনি মোরে রাখেন বান্ধিয়া।।
তোমার কৃপা বিনা কেহো চৈতন্য না পায়। তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায়।।
অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করোঁ ভয়। মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়া সদয়।।

মোরে শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ। "নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাও" কর আশীর্ব্বাদ।।
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে। ইহার বিষয়সুখ ইন্দ্রসুখ সমে।।
চৈতন্যকৃপাতে সেহো নাহি ভায় মনে। সবে আশীষ দেহ, পায় চৈতন্য চরণে।।
তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা। তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা।।
তুমি যে করাইলে এই পুলিন ভোজন। তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈল আগমন।।
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে। ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে।।
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে। অন্তরঙ্গ ভৃত্য করি রাখিবেন চরণে।।
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন। অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণ।।
সব ভক্তগণে তারে আশীর্বাদ করাইল। তাঁহা সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল।।
প্রভুর পদধূলি লইয়া স্বগৃহে আইলা। নিত্যানন্দকৃপায় আপনাকে কৃতার্থ মানিলা।।

এরপরই রঘুনাথের গৃহত্যাগ। বারদিন পথ হেঁটে পুরী এসে, মিললেন গৌরচরণে। এতদিনে যাঁর প্রাণ, তাঁকে দিয়ে রঘুনাথ স্থির হ'লেন। পরমাপ্রাপ্তি হ'ল রঘুনাথের, নিতাই কৃপাপথে, গৌর পেলেন। শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের ভাষায়—

"দেখ আনুগত্যের গতি। উপাসনার এই তো রীতি।।"

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, রঘুনাথের প্রতি নিতাইচাঁদের কৃপাদণ্ডবিধানের দুটি দিক। একদিকে সঠিক আনুগত্য শিক্ষা দান, অপরদিকে মালসাভোগ-বিধি প্রচলনের মাঝে এক সংহত সমাজব্যবস্থা প্রচলন। আজও এই উৎসব তেমনি ভাবেই হয়ে চলেছে। চিড়াদধি মহোৎসবের সাথে সেদিনের লীলাস্মরণটি যুক্ত করে একে কীর্ত্তনোৎসবে রূপায়িত করেছেন, প্রথমতঃ বোধকরি শ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়। একে পূর্ণায়ত করেছেন, তাঁরই চিহ্নিত কিংকর শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়। এখন বহুতর গোষ্ঠী এসে এই উৎসবে যোগদান বা কীর্ত্তনাদি ও প্রসাদবিতরণ করলেও, সেকালে একক শ্রীরাধারমণদেবই এই লীলাটির লোকসমাজে পুনঃপ্রকাশক। দণ্ডমহোৎসবকে ষোল আনা ভোগ করতে পারা যাবে, শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের দণ্ডমহোৎসব কীর্ত্তনটি (শ্রীগুরুকৃপার দান। ২য় খণ্ড) মনপ্রাণে অনুশীলন করলে। এ উৎসবের ঘটনাবলীর সাথে বাবাজী মহাশয়ের আর্তি আর অশ্রুগঙ্গা মিলেমিশে এক অলোক অনুভবের প্রকাশ ঘটিয়েছে। লীলাবর্ণনায় কীর্ত্তন অন্তে বাবাজী মহাশয় যখন বলেন "এই দিনে এইখানে এসেছেন আমার প্রাণের নিতাই", তখন ভেতরটা আপনিই কেঁদে ওঠে। লীলার ত্রিকালসত্যতা অনুভব করাতে বাবাজী মহাশয়ের জুড়ি নেই। নিতাইচরণে, তরুরাজ বটবৃক্ষসমীপে, সুরধুনীর কাছে কেবলই কেঁদেছেন তিনি—"কোথা গেলে নিতাই পাব দয়া করে বলে দাও।" পরে পানিহাটীবাসীর চরণে বাবাজী মহাশয়ের আকুল আক্ষেপ—"ওগো পানিহাটিবাসী! তোমরা নিত্যসিদ্ধ প্রভু-পরিকর। তোমরা ভাগ্যবান, ভাগ্যবতী। তা না হলে তোমা কেন বসতি পাবে এই পদাঙ্কিত ভূমে। তোমাদের হাতে ধরি পায়ে পড়ি। দয়া করে বলে দাও—কে

নিতাই বিহরিছে।” শেষে বাবাজী মহাশয় মিলেছেন শ্রীগুরুচরণে। জানিয়েছেন তাঁর আবেদন। অন্তরের টানে এগিয়ে গেছেন রাঘবভবনের পানে। এখানেই তাঁর অনুভবসিদ্ধ ভাবসম্মিলনে ইষ্টসাক্ষাৎকার।

এটুকু জায়গায় বোঝানো যাবে না দণ্ডমহোৎসবের তথ্য আর তত্ত্বকে। তবুও যা হয় দিক্‌দর্শন হোল। আগ্রহীজন ইচ্ছুক হলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি আকরগ্রন্থ দেখতে পারেন। শ্রীগুরুকৃপার দানও। দণ্ডমহোৎসবের আকর্ষণে যুগে যুগে পানিহাটিতে এসেছেন কত শত অনুরাগীজন। এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর নিত্যগোপাল। শ্রীরাধারমণদেব। মহাত্মা গান্ধী। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র প্রমুখ। আর বাবাজী মহাশয় তো অপতিতভাবে এসেছেন—প্রায় প্রতিবৎসরই।

জাতির জনক মহাত্মাগান্ধী, শ্রীপাট পানিহাটিতে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। দিনটি ছিল—১৮ জানুয়ারী। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ।

গান্ধীজী তখন ছিলেন সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানে। সর্বোদয় আশ্রম-আবাসে। এখানেই তিনি জানতে পারলেন পানিহাটিতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের শুভাগমনের কথা, যথাক্রমে ৯২১ বঙ্গাব্দের কার্তিকী কৃষ্ণা দ্বাদশী এবং ৯২৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে। এ কথাও জানলেন যে উভয়েই পানিহাটিতে এসে স্থানীয় সুজন—শ্রীরাঘব পণ্ডিতের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সাময়িক উপস্থিত ছিলেন গঙ্গাতীরে বটের তলায়। পানিহাটির পল্লীকবি শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন বৃত্তিতে ব্যারিষ্টার, কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল ভক্তিরসে টইটম্বুর। তিনিই ঈশ্বরপ্রেরিত দূতের ভূমিকায়, এসে উপস্থিত হলেন বাপুর কাছে। এই সাংস্কৃতিক বিদগ্ধ জন, অনেক আগের এক ইতিহাসের পাতাকে এগিয়ে দিলেন গান্ধীজীর সমীপে। একটি কবিতায় ভরা চিঠিতে অনেক কথার মাঝে সুরেশচন্দ্র লিখলেন গান্ধীজীকে উদ্দেশ্য করে—“সোদপুরে এসে একদিনও তুমি এলে না কো পানিহাটি।

আমার প্রভুর পায়ের পরশে সোনা হল যার মাটি।।”

মহাপ্রভুর-পানিহাটিতে শুভাগমনের যাবতীয় বৃত্তান্ত জানিয়ে সুরেশচন্দ্র আরও লিখলেন, একটি কবিতায়— “অদূরে পতিতপাবনী গঙ্গা বয়ে যায় ধীরে ধীরে।

এই বাঁধা ঘাট এই সেই বট, দাঁড়ায়ে নদীর তীরে।।”

সবশেষে সুরেশচন্দ্র আবেদন রাখলেন, মহাত্মাজীর কাছে—

“বাপুজী! বাপুজী! আমাদের এই একান্ত নিবেদন।
ক্ষণতরে তুমি পানিহাটি যেও জুড়াইতে তনু মন।।”

স্বনামধন্য সাংবাদিক তথা **“ভারতবর্ষ”** পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই কবিতাটি দিলেন মহাত্মাজীর হাতে। সর্বোদয় আশ্রমের সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বসেছিলেন গান্ধিজীর পাশে। তিনি পড়ে শুনিয়ে দিলেন কবিতাটি আর মর্মবিশ্লেষণ করে সব জানালেন মহাত্মাজীকে। শোন মাত্রই সাগ্রহে আনন্দে গান্ধিজী, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পানিহাটির বটতলায় (দণ্ডমহোৎসবতলা) আসতে রাজি হলেন। নির্দ্ধারিত ১৮ জানুয়ারী (১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ) প্রত্যূষে গান্ধিজীকে আনতে গাড়ী গেল সোদপুরে। বাপু

কিন্তু গাড়ীতে উঠলেন না। সোজা হেঁটে চলে এলেন গঙ্গাতীরে বটতলে। আসতে আসতে বললেন, স্মিত হেসে—"তীর্থে যেতে হলে হেঁটেই যেতে হয়।" হেঁটেই গেলেন এবং দর্শন করে ফিরে এলেন সর্বোদয় আশ্রমে।

দণ্ডমহোৎসবস্থানে (বটতলায়) এসে গান্ধিজী, আবেগে পরিপ্লুত হয়ে একমনে বটতলা পরিক্রমা করলেন, বহুবার। সাথে পূর্বোক্ত সতীশবাবু প্রমুখ বহু জন। সতীশবাবু তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালেন। বলতে লাগলেন যাবতীয় বিবরণ। শ্রীরাধারমণ চরণদাস দেবের একান্ত অনুগৃহীত জন, সার্থকনামা পানিহাটিবাসী—শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট মহোদয়, মহাত্মাজীকে আপ্যায়িত করতে তাঁর "গৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির" হতে বহুতর দুর্লভ সংগ্রহের এক সাময়িক প্রদর্শনী সাজিয়েছিলেন। তাতে শ্রীচৈতন্যের হস্তলিপি, ব্যবহৃত কাঁথা, চাদর ও কমণ্ডলুর অংশ বিশেষ সহ নিত্যানন্দ প্রভুরও স্মৃতিপূত নানা দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়েছিল। বটতলা-পরিক্রমা শেষে মহাত্মাজী বিশেষ আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সাথে এগুলি পুংখানুপুংখভাবে দর্শন করেন এবং ভক্তিনম্র অন্তরে বারবারই প্রণাম নিবেদন করতে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভাগমনের দিন-তারিখ এই পুস্তকে থাকলেও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে—"শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে"র ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে এবং পূজনীয় স্বামী সারদানন্দের—"শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" গ্রন্থে। আগ্রহীজন, দেখুন।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এসেছিলেন এখানে, কিন্তু সেই বিবরণ এখনও সংগ্রহ করা যায়নি। পেলে, পরবর্তী সংস্করণে জানাবার ইচ্ছা রইল। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ঠাকুর নিত্যগোপাল—বিষয়ে একই কথা। নিত্যানন্দ-তন্ময় শ্রীরাধারমণদেব এখানে এসেছেন বহুবার। তার মাঝে বেলঘরিয়া (বটুবাবুর বাগানবাড়ী) থেকে বরাহনগরের ঘাট হয়ে নৌকা যোগে এসেছিলেন যেবার, সেবারের কথা "চরিত সুধা"র দ্বিতীয় খণ্ডে বিরাজমান। সম্ভবতঃ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি পড়েছিল রবিবারে। তাই শ্রীরাধারমণের সাথে, কুঞ্জবাবুর ব্যবস্থাপনায় বহুতর সমাগম। সংকীর্ত্তনানন্দে বজরা (নৌকা) ডুবুডুবু। সংকীর্ত্তন আর নটনে, মাঝিরও ভয় ধরেছিল যে, নৌকা হয়ত ডুবে যবে। যা্ক তীরে **উঠে বটতলে শ্রীরাধারমণদেবের কীর্ত্তনে সবার অভাব ঘুচে গেল। লীলাপ্রসঙ্গে, লীলারস মূর্ত্তিমান হয়ে দাঁড়ালেন অধিকারী আর অনধিকারী, সবারই সামনে। "লীলাপ্রসঙ্গ হয় যেখানে। লীলাপ্রকট হয় সেখানে।।"—অনুভবীর এই সূক্তিটি, সবার মরমে এঁকে দিলেন শ্রীরাধারমণ। এ বিষয়, বলে বুঝাবার নয়। "আপনিও যেই মত প্রভু নিত্যানন্দ। সেই মত করিলেন সব ভক্তবৃন্দ।।" যোগ্য আর অযোগ্য সকলেই অনুভব করেছিলেন এ কথার মর্ম্ম। জলে, স্থলে, মাঝগঙ্গা অবধি নৌকার উপরে, সবাইই আস্বাদন পেয়েছিল কীর্ত্তন আর প্রসাদের। সব একাকার করেছিলেন— নিতাইচাঁদ, শ্রীরাধারমণের বুকে বসে। সেনেদের ঠাকুর বাড়ীর বাগানে, প্রসঙ্গরসের বিহ্বলতায় আবির্ভূত হয়েছিল বৈকুণ্ঠের সুরসভা।** কৌতূহলীজন "চরিতসুধা" দেখলে সব জানতে পারবেন—এবিষয়ে। নিতাই-পাগল শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের পানিহাটিকেন্দ্রিক নামপ্রসঙ্গ আর কীর্ত্তনে ভাববিথারের কথাতেই একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হবে। সে বিষয়ে এখন নিরস্ত থাকলাম।

বর্ত্তমান প্রজন্মের কাছে, প্রায় আঠারো আনা বিস্মৃতির অথৈ সায়রে তলিয়ে যাওয়া একটি পূণ্যব্র স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব—অমূল্যধন রায় ভট্ট। তিনি ঐতিহাসিক, অভিনেতা, তন্নিষ্ঠ আচার্য, লেখক, সংগ্রা মরমীভক্ত, প্রেমিক, সেবাপ্রাণ—কি তিনি নন! একটি সজীব গবেষণাগার!! অপার অনুসন্ধিৎ অবাধ সমন্বয়। তাঁর অমর জীবন—অনাবিল বৈচিত্রের এক অমলিন ঐক্যপর্ব। তাঁর অ

অধ্যবসায়, আমাদের মত অনুশীলনহীনদের একান্ত অবলম্বন। সৌরকিরণের মত স্বকীয় প্রভায় তাঁর জীবন উদ্ভাসিত। সেই অমর্ত্ত জীবন-জলধি পরশের ক্ষীণপ্রয়াস—এখানে, দুই/পাঁচ লাইনের স্বল্প পরিসরে।

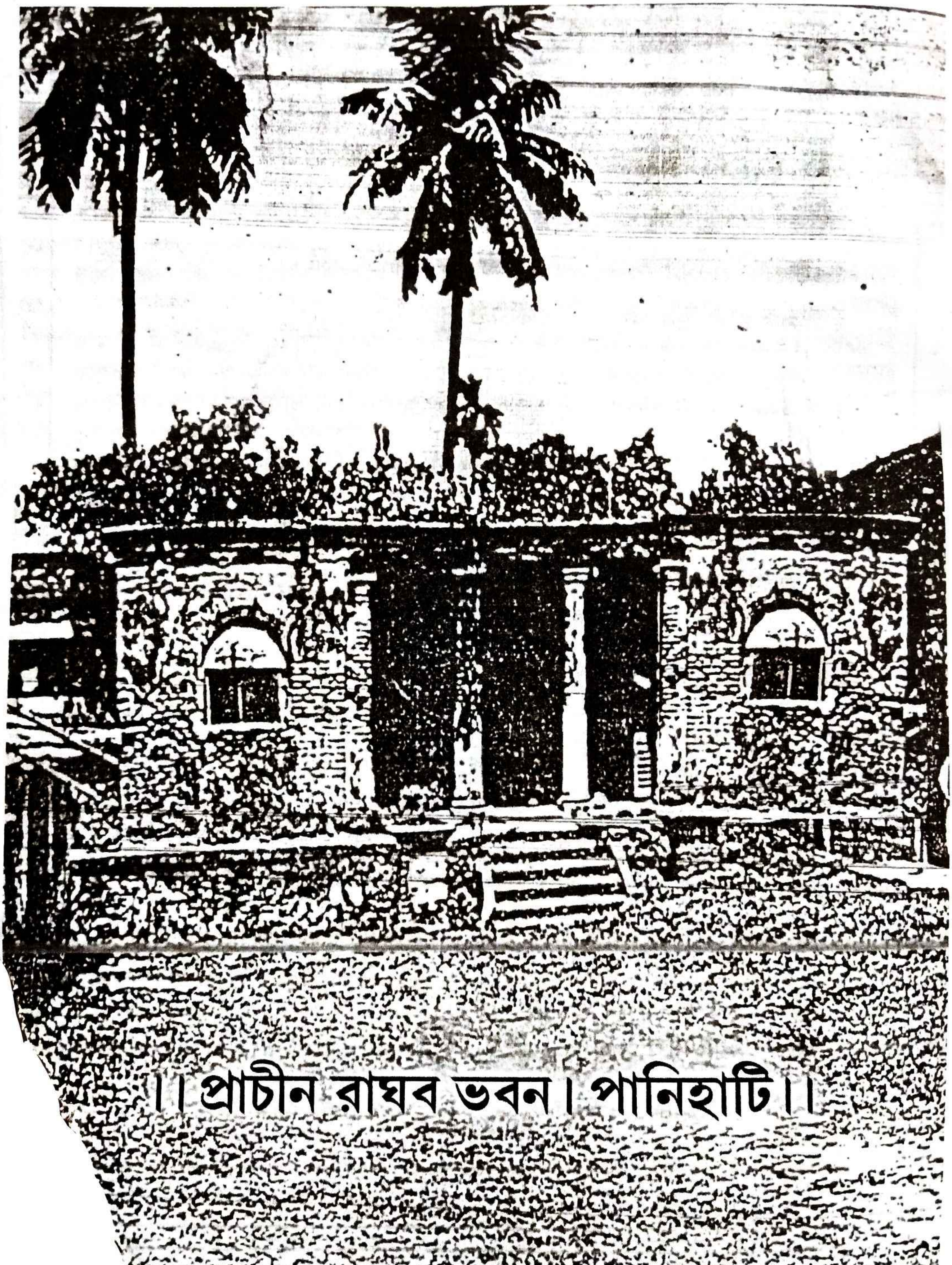
অমূল্যধনের শুভ আবির্ভাব ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২০ অগ্রহায়ণ। বৃহস্পতিবার। জন্মস্থান আরামবাগের ডোঙ্গর গ্রামে। বাবা—বাবুরাম। মা—শশীমুখী। শৈশবেই বাবার মৃত্যু। পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় মায়ের সাথে চলে এলেন আপন মাসী ত্রৈলোক্যতারিণীর পানিহাটির বাড়ীতে। পরে মামা কৈলাস রায়ও এসে থাকতে লাগলেন পানিহাটিতেই। ছেলেবেলায় দিদির সাথে উত্তরবঙ্গের পাবনাতেও তিনি ছিলেন, কিছুকাল। পরে তিনি পানিহাটিতেই ফিরে আসেন। তাঁর অভিভাবককূল, তাঁর পড়াশোনার জন্য বহুতর চেষ্টা করলেও, তাঁর পুঁথিগত পড়াশোনা খুব এগোয় নাই। ছেলেবেলা কাটলো—অভিনয়, ইঁট তৈরি, মুড়িভাজা, ম্যাজিক শেখা, ছবিতোলা, আরও নানা অনুশীলনে। জোয়ান বেলায় পালালেন ঘর ছেড়ে, সন্ন্যাসী হবেন বলে। ঘুরে এলেন অল্পদিনে, অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে। এরপর নিয়মিত সান্ধ্য সংকীর্ত্তন করতে লাগলেন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে। বর্ত্তমান দণ্ডমহোৎসবতলার পুণ্য অঙ্গনে। মাসির আশ্রয়ে থাকতেন জনৈক শ্রীপতি রায়। ইনি পরবর্তী সময়ে, শ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের সাথে পরিচিত হয়ে, তাঁর কাছেই বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের নাম হয় শ্রীশ্রীধর দাস বাবাজী। ইনি পুরীতেই থাকতেন, শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে ঝাঁজপিটা মঠে। এঁর বহু অলৌকিক সামর্থ্যের বিষয় শোনা গেছে, অমূল্যধনের প্রথমা সন্ততি, আমাদের বীণাদিদির কাছে। অমূল্যধনের ওপরে এঁর বিস্তর প্রভাব পড়েছিল। ইনি দেহত্যাগ করলে অমূল্যধনের প্রযত্নে, পানিহাটির নিত্যানন্দ হরিসভায় এঁর স্মৃতিস্মারকটি স্থাপিত হয়েছে। শ্রীশ্রীধর দাস বাবাজী ছাড়াও যাঁদের অমোঘ প্রভাব অমূল্যধনের মর জীবনকে, অমৃতত্বে অভিষিক্ত করেছে, সেই ত্রয়ী হচ্ছেন, শ্রীরাধারমণচরণদাসজী, শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় ও বোধকরি স্বল্পকালীন হলেও শ্রীমৎ নবদ্বীপচন্দ্রদাসজী। প্রথমোক্ত দুজনের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয় দণ্ডমহোৎসবতলায়, আর নবদ্বীপ দাসজীর সাথে তাঁর একাত্মতা ঘটে রাঘবভবনে। নবদ্বীপ দাসজীর মুখে, পাশ্চাত্যদর্শন হতে প্রাচ্যদর্শনের নিগূঢ় মর্ম যেমন তিনি জানলেন, তেমনিই পেলেন আলোর সন্ধান, জীবনপথে এগোতে। অনুভব করলেন এ জীবনে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই মুখ্য উদ্দেশ্য। নবদ্বীপ দাসজীই তাঁকে মিলিয়ে দিলেন শ্রীরাধারমণদেবের সাথে। মিলনের মুহূর্ত্ত হতেই শ্রীরাধারমণ তাঁর মানসমন্দিরে একচ্ছত্র হয়ে বসলেন। বাকি জীবনটি তিনি বেঁচে ছিলেন শ্রীরাধারমণদেব, আর তাঁর অবর্তমানে, তাঁরই নির্বাচিত উত্তরসূরী, শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ-প্রসঙ্গ আর আদেশ-উপদেশকে জীবাতু করে। নবদ্বীপদাসের ওপরে, তাঁর বিস্তৃত রচনা রয়েছে "ভক্তি" পত্রিকায়। নবদ্বীপের রাধারমণ সেবাশ্রমের সাধু নিত্যানন্দ দাসজীও তাঁর আদর্শস্বরূপ ছিলেন। **অমূল্যধনের আপন হাতে লেখা "নোটবুকে"র একই পাতায় পরপর শ্রীরাধারমণদেব (১), নবদ্বীপ দাসজী (২) ও সাধু নিত্যানন্দ দাসের (৩) কয়েকটি উপদেশ, দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলি হল—(১) ব্যক্তিগত লক্ষ করিও না। হৃদয় সংকীর্ণ করিও না। নিতাই কোনও অভাব রাখবেন না। কোনোও ভয় নেই,ভাবনা নেই। লোকের দোষ দৃষ্টি করিও না। জগৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। অনিন্দুক হইয়া নাম লইবে। (২)দীন হও। আবার দেখা হবে। (৩) সকলকে ভালোবাসো। মনের জোর কর। সব কাজের মধ্যেই ভগবানকে দেখ। জীবের সেবা , পরোপকার কর। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে, সুখ ভোগের জন্যে আমরা জন্মাইনি, কেবল কাজ কর। সুখে, দুখে অচল অটল থাকো।**

চাকরি, ব্যবসা, দালালি, কম্পাউণ্ডারি, স্বদেশী, ঠিকেদারি, চিকিৎসা,দোকানদারি, শেষে সব এসে মিললো ভক্তি-ধর্ম যাজনের পূণ্যসঙ্গমে। এখন হতে অমূল্যধন হলেন শ্রীরাধারমণৈকজীবন। অমূল্যধনের বড় মেয়ে বীণাপাণি দেবির কাছে, চন্দননগরে শ্রীযুক্ত নিতাই রায়ের ঘরে, পানিহাটিতে হাবলা দাদা (হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়) ও দণ্ডমহোৎসবতলার প্রবীণ সেবক মুকুন্দদাদার কাছে, চক্-ইসলামপুরের (মুর্শিদাবাদ) অরুণকৃষ্ণ ঘোষ দাদার দপ্তরে, রাঘববংশিয় ব্রজেন গোস্বামীর রাধাবল্লভ অঙ্গনে, শ্রীপাট পালপাড়ার শ্রীমৎ কেশবপ্রিয় ব্রহ্মচারীদাদার ভাণ্ডারে, অমূল্যধনের লেখা যে সব কাগজপত্র দেখেছি, তা সে ব্যবহারিক বা পারমার্থিক যাই হোক না কেন, সর্বত্রই, সব কাগজের মাথায় লেখা দেখেছি একটি মাত্র শব্দ—"শ্রীশ্রীরাধারমণ"।

জীবনের গোড়া থেকেই তাঁর আচরণে যে সুষম পরমার্থবোধ দানা বেঁধেছিল, তা এতদিনে পূর্ণিমার চাঁদের মত ষোলকলায় বিকশিত হল তাঁর চরিতে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সারস্বত সাম্রাজ্যের তিনি হয়ে উঠলেন সুচিহ্নিত সভাসদ। মুখচেনা নয়, বিশেষ পরিচিত হলেন তিনি ভক্তিরাজ্যে। বহু দূর দূরান্তে গিয়ে, কত কষ্ট সহ্য করে যে তিনি, নানা ইতিহাস সংগ্রহ ও প্রকাশ করে ভক্তিভাণ্ডারকে পূর্ণায়ত করলেন, সে হিসাব বোধকরি আজ কালগর্ভগত। ছেলেবেলায় তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন, রিডিং ক্লাবের বার্ষিক উৎসবে, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের হাত হতে। স্কুলে পড়ার সময়ে আদৃত হয়েছিলেন তৎকালীন ব্যারাকপুর মহকুমার শাসক হপকিনসন সাহেবের কাছে। আর এখন তাঁর যশঃসৌরভ দেশকে ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গেল। তাঁর 'বৈষ্ণবচরিতঅভিধান' ও 'দ্বাদশগোপাল' দুখানি গ্রন্থ উৎসর্গীত হয়েছিল, শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় ও শ্রীরাধারমণদেবের করকমলে। এ দুটি বই, অযুত গৌরবে মহীয়ান্ হয়েছে বিভিন্ন পত্র, পত্রিকা, গ্রন্থাদি ও মহাজনদের কলমে। স্বনামধন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ লিখলেন—"এই জাতীয় গ্রন্থ বৈষ্ণব সাহিত্যে কেন, বাংলা সাহিত্যেও বোধ হয় এই প্রথম। বাংলা সাহিত্যে, ভট্ট মহাশয়ের গ্রন্থ দুইখানির একটা বিশেষ মূল্য আছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের অভ্যুত্থান। যাঁহাদের লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম, যাঁহাদের ভাব বৈষ্ণব সাহিত্যের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ, তাঁহাদের জীবনীই ভট্ট মহাশয়ের গ্রন্থ দুইখানিতে বিবৃত হইয়াছে।.... গ্রন্থ দুইখানি ভট্টমহাশয়ের অমর কীর্ত্তি।" "ভক্তি" পত্রিকায় প্রকাশ পেল—"ভট্ট মহাশয় যদি অভিধানটি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে একমাত্র এই গ্রন্থ দ্বারাই তিনি কেবল বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকটে নহে, ভারতের সমুদয় হিন্দু-সমাজের নিকট চিরজীবী হইয়া থাকিবেন।" তৎকালিন সাময়িক পত্র পত্রিকায় (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা। সুবর্ণ বণিক সমাচার। সচিত্র মাসিক বসুমতী। "ভক্তি" পত্রিকা। "শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ" পত্রিকা। "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসেবক" পত্রিকা) তাঁর বহুতর প্রবন্ধাদি প্রকাশ পেয়েছে। ১৩২২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় তাঁর লিখিত "শ্রীমদ্ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটি মাহাত্ম্য" প্রবন্ধটি বিদগ্ধমণ্ডলীর বিচারে সসম্মানে উওরিত হয়। অমূল্যধন "শিশির কুমার ঘোষ পুরস্কার" লাভ করেন। তখনকার বাজারে নগদ ২৫ টাকা।

অমূল্যধনের মহত্তম কীর্ত্তিস্তম্ভ "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থ মন্দির"—যার প্রকাশ বিভিন্ন স্থানে "বৈষ্ণব প্রদর্শনীর" বিপুল আয়োজনে। সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যাবে, এর আমোঘ সমর্থন।

-ঃ জয় নিতাই ঃ-



।। প্রাচীন রাঘব ভবন। পানিহাটি।।

[illegible] প্রভু নিত্যা[illegible]

শ্রীমুখের শেষ আজ্ঞা ;— শ্রীরাধা[illegible]

১। ব্যক্তি মত নষ্ট করিও না।
২। হামেশা সংকীর্ত্তন করিও না।
৩। নিতাই কোন অভাব রাখবে না।
৪। লোকের দোষ দৃষ্টি করিও না।
৫। দান দাক্ষিণ্য প্রকাশ্যে না।
৬। অনিচ্ছুক হইলে নাম দিও না।
৭। কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই।
৮। ঠাকুরবাড়ীর তলাতে গড়াগড়ি দিবে।

শ্রীনবদ্বীপ দাদার আজ্ঞা ;—
১। দীন হও।
২। তাঁহার দেখা হবে।

নিত্যানন্দ দাদের আজ্ঞা।
১। সকলকে ভালবাসো।
২। মনের জোর কর।
৩। সব কাজের মধ্যে ভগবানকে দেখ।
৪। জীবের সেবা, পরোপকার কর।
৫। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে সুখ পাবার মনে আমরা কর্মশীল, কেবল কার্য্য কর।
৬। সুখে দুঃখে আনন্দ অটল থাকো।

শ্রীশ্রীরাধারমণৈকজীবন শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্টের আপন হাতে, প্রায় একশত বছর লেখা খাতা হতে, তাঁর প্রতি — শ্রীরাধারমণদেবের (শ্রীমুখের আজ্ঞা) শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের ও সাধু নিত্যানন্দের উপদেশের নকল —



শ্রীশ্রীরাঘব পণ্ডিতের সমাধিপীঠ

রাঘব ভবন। পানিহাটি।